# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১৫ - ২১ এপ্রিল, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা


আন্না হাজারের দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন

## গণতান্ত্রিক আন্দোলনই দুর্নীতি ও অনৈতিকতার একমাত্র প্রতিষেধক হতে পারে

শ্রী আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেছেন,

সমাজকর্মী শ্রী আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন যে সকল ন্যায্য দাবি উত্থাপন করেছে আমাদের দল সেগুলি সম্পূর্ণ সমর্থন করছে এবং ঐ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি জানাচ্ছে। এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, একটি আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা কখনই স্বেচ্ছায় এই দাবিগুলি মেনে নেবে না। আবার কখনও যদি 'মেনে নিচ্ছি' বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয় তবে সেটাও করবে শুধুমাত্র জনগণকে ঠকাবার জন্য।

লক্ষ করা দরকার, যে ভারতে আজ ক্ষমতার অলিন্দে বিরাজমান ডান-বাম নির্বিশেষে রাজনীতিকদের নির্লজ্জ দুর্নীতিপরায়ণতা ও ভণ্ডামির প্রদর্শনী চলছে, সেই ভারতই একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পেয়েছিল উচ্চ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন রাজনীতিকদের। পরবর্তীকালের চরম অধঃপতন কোনও দুর্ঘটনা নয়। দেশে বিদ্যমান যে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয়র জন্য মুনাফা ও বিপুল সম্পদ এবং বাকি কোটি কোটি মেহনতি মানুষের জন্য শোষণ-জুলুম-ক্ষুধা-বঞ্চনা-নিঃস্বতা সৃষ্টির নিয়মের দ্বারা— সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজেই যাবতীয় দুর্নীতি ও অনৈতিকতার জন্মদাতা। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সমগ্র দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এই নৈতিক অধঃপতন সমগ্র রাষ্ট্রকাঠামোয় অর্থাৎ আমলাতন্ত্র-পুলিশ-মিলিটারি-বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সকল শাসক দল, যারা এই দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সেবা করে তারা কেউই নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্ত ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত না হয়ে পারে না। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে দেশের এই রাজনৈতিক ছবি পাল্টাবে না। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই সফল হতে পারবে না, যদি তা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত না হয়। বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের জন্য জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবী নৈতিকতার আদর্শে বলিয়ান হয়ে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব সম্পন্ন করা। যতদিন তা না করা যাচ্ছে, ততদিন দুর্নীতি-বিরোধী আইন প্রণয়নের ও তার প্রয়োগের দাবিতে শ্রমিক সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, বর্তমান পুঁজিবাদী সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অনৈতিকতার মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে একমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনই প্রতিষেধক রূপে কাজ করতে পারে।

# গণআন্দোলনের স্বার্থে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের জয়ী করুন

ভারতবর্ষের একটা অত্যন্ত দুঃসময়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ ৪টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতবর্ষের জনজীবনে যত সংকট — দারিদ্র্য, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারত্ব, নারীর ইজ্জতহানি, মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধের অবনমন, ব্যাপক দুর্নীতি, গণআন্দোলনে নিপীড়ন প্রভৃতি যা কিছু জনবিরোধী, কংগ্রেস তা করে এসেছে এবং করে যাচ্ছে। বিজেপিও এর ব্যতিক্রম নয়। সিপিএম সরকারে এসে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার উদগ্র বাসনায় জনগণের প্রত্যাশাকে পদদলিত করে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে। যার পরিণামে আজ রাজ্যের মানুষের দুর্গতি চরমে পৌঁছেছে। মালিকতোষণ নীতির ফলে সারা দেশের মতোই এ রাজ্যেও ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। সিপিএম ফ্রন্ট শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের ফি, হাসপাতালে চার্জ বাড়িয়েছে। শিক্ষায়, চিকিৎসায় বেসরকারিকরণ চালু করেছে। শহর এমনকী গঞ্জ এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিয়েছে. যৌনশিক্ষা চালু করেছে। বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, রেশন ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রতিটি পরিষেবা ক্ষেত্রেই মুনাফা লুঠতে বেসরকারি একচেটিয়া পুঁজির জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। এগুলো ক্রমেই গরিব মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

*জয়নগরে এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট প্রার্থী কমরেড তরুণ নস্করের সমর্থনে ১০ এপ্রিল প্রচার মিছিলে সামিল বিশিষ্ট নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী, সুজাত ভদ্র, রূপশ্রী কাহালি প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা*

সিপিএম অতীতে যতটুকু বামপন্থার চর্চা করত, সরকারি ক্ষমতায় বসার পর থেকে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে তাও জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে নৃশংসভাবে দমন করে এসেছে। সিপিএম গোটা রাজ্যে সন্ত্রাস চালিয়ে এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করেছে যাতে সাধারণ মানুষ মুখ না খুলতে পারে। সরকারি প্রশাসন, পুলিশ, কালোবাজারি - ব্যবসাদার, ক্রিমিনালবাহিনী ও সিপিএম দলের সম্মিলিত একটা দুষ্টচক্র কন্ট্রাক্টরি, প্রোমোটারি, দুর্নীতি, তোলাবাজির রাজত্ব কায়েম করেছে। ফ্রন্টের দলগুলির নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতির সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সাধারণ চোর-ডাকাতদেরও তারা হার মানাচ্ছে। পুঁজিপতি শ্রেণীর গোলামি করতে গিয়ে পাবলিকের টাকা আত্মসাৎ করা, ভোগবিলাসী জীবনযাপন সহ হেন কুকর্ম নেই যা আজ এই দলগুলির নেতা-মন্ত্রীরা করে না। সিপিএমের দীর্ঘ শাসন গোটা সমাজকে এক চরম নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফ্যাসিস্টিক কায়দায় গণআন্দোলন দমনে ট্রেনিং দিয়ে সংগঠিত সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী গড়ে তুলেছে সিপিএম। এই ক্রিমিনাল বাহিনী নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর-লালগড়ে গণহত্যা, গণধর্ষণ করে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে, মাঠের ফসল নষ্ট করে হাড় হিম করা সন্ত্রাস চালিয়েছে। এ কারণেই আমরা মনে করি,

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন

## এআইডিএসও ২৯ আসনে জয়ী

১ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এআইডিএসও ২৯টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চরম পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও ইংরেজি ২য় বর্ষে এবং লিঙ্গুইস্টিকস ২য় বর্ষে এস এফ আই একটিও আসন পায়নি। শুধু তাই নয়, ইংরেজি ২য় বর্ষের মোট পাঁচটি আসনের কোনওটিতেই তারা একটি ভোটও পায়নি। এমনকী তাদের প্রার্থীরাও নিজেদের ভোট দিতে আসেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা, শিক্ষার উপর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নানা আক্রমণ ইত্যাদি ইস্যুতে এআইডিএসও-র লাগাতার আন্দোলনের কথা ছাত্রছাত্রীরা ভালই জানে। এসএফআই ক্রিমিনালদের লাগাতার সশস্ত্র আক্রমণে বারে বারে রক্তাক্ত হয়েও একমাত্র এআইডিএসও কর্মীরাই মাটি কামড়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এবারও এসএফআই এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে যাতে এসএফআই সমস্ত আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে ইউনিয়নের ক্ষমতা দখলে

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

এস এস কে এম (পি জি) নির্বাচন

## আবারও সংসদ পেল ডি এস ও

এবার নিয়ে পরপর তিনবার আই পি জি এম ই আর (ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ) এসএসকেএম-এ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এসএফআই-কে পরাস্ত করে ছাত্রছাত্রীদের বিপুল সমর্থনে ৮ এপ্রিল জয়যুক্ত হল এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা। প্রথম নির্বাচনে ১১-২; দ্বিতীয়বার ১২-১; তৃতীয়বার ১৩-০তে এসএফআই-কে পরাস্ত করল ডিএসও। এই জয় প্রমাণ করল শাসকদল সিপিএম-এর ছাত্র সংগঠন এসএফআইর র‍্যাগিং, সন্ত্রাস ও ছাত্রস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ডিএসও-ই ছাত্র আন্দোলনে একমাত্র বিকল্প শক্তি।

এই নির্বাচনে সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ সমস্ত পদে ডিএসও প্রার্থীরা জয়ী হন। সাধারণ সম্পাদক সৌমাভ চ্যাটার্জী, সভাপতি দেবার্জিত কুণ্ডু, কোষাধ্যক্ষ কবিউল হক নির্বাচিত হন।

ডিএসও-র নেতৃত্বে এনআরআই কোটায় ক্যাপিটেশন ফি বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল আই পি জি এম ই আর (এসএসকেএম)

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

হলদিয়া ডক ইন্সটিটিউট নির্বাচনে

## একটিও আসন পেল না সিটু

হলদিয়া ডক ইন্সটিটিউটকে হলদিয়া বন্দরের সমস্ত কর্মী ও অফিসারদের একটি ক্লাব বললে ভুল হবে। খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রন্থাগার, কলকাতায় ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল, সাঁতার, গান, আবৃত্তি প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে হলিডে হোম, ভেলোরে চিকিৎসা করতে যাওয়া রোগী পরিবারের থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে এই ইন্সটিটিউটের কর্মক্ষেত্র বহুমুখী।

২৫ মার্চ এই ইন্সটিটিউটের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে কলকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে তিনটি ইউনিয়নের জোটের প্যানেল — সিপি অ্যান্ড এসএমইউ(সিটু)-র প্যানেলের সমস্ত প্রার্থীকেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে। সিটু-র প্যানেল যেভাবে ধরাশায়ী হয়েছে, তাতে বোঝা যায় বিরুদ্ধ তিনটি ইউনিয়নের সদস্য ছাড়াও সিটু-র বেশিরভাগ সদস্যই সিটু-র বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। দু'বছর আগের নির্বাচনে সিটু একটি মাত্র প্রার্থীকে জেতাতে পেরেছিল। কিন্তু ২০০৭ সালের আগে পর্যন্ত ছিল সিটুর একচ্ছত্র আধিপত্য। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের ধারায় এই আধিপত্য চূর্ণ হয়ে যায়।

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

## প্রবীণ পার্টি সদস্যের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কমলকান্তি ঘোষ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৭ বসর বয়সে ২৩ মার্চ বহরমপুর রবীন্দ্রনাথ টেগোর ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পূর্ববঙ্গের বরিশালে তাঁর জন্ম হয়। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেই সময় তিনি এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং এই আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় গোবিন্দসুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন এবং এস ইউ সি আই (সি) দলের কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। অবসরগ্রহণের পরও তিনি সেই ধারা বজায় রাখেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে কমলবাবুর নাম প্রথম সারিতে। বন্যা-ভাঙন রোধ আন্দোলনে তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন এবং এ জন্য তাঁকে কারাবাস করতে হয়, পুলিশি নির্যাতনও সহ্য করতে হয়। মৃত্যুর পর নার্সিংহোমে তাঁর শুভানুধ্যায়ী শিক্ষকরা এবং দলের কর্মীরা উপস্থিত হন। তাঁর মরদেহে এস ইউ সি আই (সি) দলের জেলা সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, বহরমপুর লোকাল কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বহু শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ৩১ মার্চ বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব হলে স্মরণসভায় তাঁর জীবনসংগ্রামের নানা দিক আলোচনা করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন লোকাল সম্পাদক কমরেড এ বিশ্বাস।

**কমরেড কমলকান্তি ঘোষ লাল সেলাম**

## এ আই ডি এস ও ২৯ আসনে জয়ী

*একের পাতার পর*

থাকতে পারে। সেজন্য এবারের নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি গোপন রাখতে চেয়েছিল তারা।

অন্যদিকে, ছাত্রসংসদের সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে ৩ মার্চ থেকে এআইডিএসও কর্তৃপক্ষের কাছে একের পর এক দাবিপত্র পেশ করে আসছিল। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত ২১ মার্চ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। দেখা যায়, নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ লেখা আছে ১৭ মার্চ, অর্থাৎ চারদিন আগেই এই বিজ্ঞপ্তি হাতে পেয়ে গেছে এসএফআই। ২৫ মার্চ নমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হওয়ায় এআইডিএসও-র হাতে ছিল মাত্র চারটে দিন। এর উপর ছিলএসএফআইয়ের হুমকি — 'এআইডিএসও-র প্রার্থী হলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হবে', 'পরীক্ষার নম্বর কমিয়ে দেওয়া হবে', 'পারসেন্টেজ কমিয়ে দেওয়া হবে' ইত্যাদি। এ সবের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট, আলিপুর ও রাজাবাজার সায়েন্স ক্যাম্পাসে এআইডিএসও ৭২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল।

তার উপর, এআইডিএসও-র বেশ কয়েকজন প্রার্থীর নমিনেশন বাতিল করে মাত্র ৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রাখা হয়। গণনার টেবিলেও এসএফআই-এর পক্ষপাতিত্ব করা হয়। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ৪৭টি আসনে লড়ে ২৯টি আসনে জয়ী হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন হয়েছে এমন বেশিরভাগ আসনেই হেরেছে এসএফআই। ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকেই এই অভিমত উঠে এসেছে যে, যদি যথার্থ গণতান্ত্রিক রীতি মেনে নির্বাচন হত তবে ৪৭টির মধ্যে একটি আসনেও এসএফআই জিততে পারত না।

## খাল সংস্কারের দাবিতে তমলুকে বিক্ষোভ

তমলুক মহকুমার 'সোয়াদিঘী' ও 'গঙ্গাখালি' খাল সংস্কারের দাবিতে ১০ মার্চ ৫ শতাধিক মানুষ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। এই খালদুটির মাধ্যমে কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, শহিদ মাতঙ্গিনী, তমলুক ব্লকের প্রায় তিন শতাধিক মৌজার জলনিকাশি ও জলসেচ হয়। ১৯৮৬ সালের পর থেকে দীর্ঘদিন পূর্ণ সংস্কার না হওয়ায় প্রায় লক্ষাধিক মানুষ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন। ভুক্তভোগীরা 'সোয়াদিঘী ও গঙ্গাখালি খাল সংস্কার সমিতি' গঠন করে আন্দোলন করলে প্রশাসন ১৯.৫ কিমি দীর্ঘ সোয়াদিঘী খালের জন্য ৫ কোটি ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ও ১৬.৮ কিমি দীর্ঘ গঙ্গাখালি খালের জন্য ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার স্কিম করে নাবার্ডের কাছে ঋণ নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থদপ্তর। তাদের সম্মতি না পাওয়ায় আগামী বর্ষার পূর্বে খাল দুটি সংস্কার করা যাবে না বলে জানালেন সেচ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার। ফলে আগামী বর্ষায় ফের জলবন্দী হওয়ার আশঙ্কায় দিন গুনছেন অধিবাসীরা। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সোয়াদিঘী খাল সংস্কার সমিতির পক্ষে মধুসূদন বেরা, সুরজিৎ মান্না, নিবাস প্রামাণিক এবং গঙ্গাখালি খাল সংস্কার সমিতির পক্ষে চন্দ্র মানিক, নিবাস পাত্র, সাধন চন্দ্র মান্না, অমিয় মাল। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর বন্যা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য ডাঃ সন্তোষ মাইতি।

## আবারও সংসদ পেল ডি এস ও

*একের পাতার পর*

এবং মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ। কিছুদিন আগে যখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সাড়ে তিন বছরের অবৈজ্ঞানিক ডাক্তারি কোর্স (বিআরএমএস), গ্রামীণ ইনটার্নশিপ চালু করতে চেয়েছিল তখন ডিএসও-র আন্দোলনই এই হীন চক্রান্ত রুখে দেয়। সম্প্রতি অন্যায়ভাবে মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ভেঙে দিয়ে মেডিকেল শিক্ষা ধ্বংসকারী 'ভিশন ২০১৫' নীতি চালু করে ডাক্তারি কোর্স সংক্ষিপ্ত করে চার বছরের করে দেওয়া, ডাক্তারির বিষয়গুলিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপশনাল করে দেওয়া, পিপিপি-র মডেলে কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা, পরিকাঠামোর উন্নতি না করেই সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য মেডিকেলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সহ মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবসায়ীকরণ ও বাণিজিকীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে এই জয় আরও শক্তিশালী করবে। ফল ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল সহকারে উল্লাসে ফেটে পড়ে।

এসএফআই-এর ভীতি প্রদর্শন, প্রশাসনের একাংশের অসহযোগিতা সত্ত্বেও এই অভূতপূর্ব জয় ছিনিয়ে আনার জন্য আই পি জি এম ই আর (এসএসকেএম)-এর সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান এ আই ডি এস ও-র এসএসকেএম শাখা সম্পাদক ডাঃ গৌরাঙ্গ প্রামাণিক। তিনি বলেন, বিজয়ী ছাত্র সংসদ ন্যাশনাল এগজিট এন্ট্রান্স সহ চার বছরের ডাক্তারি কোর্সের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তুলবে। অন্যান্য মেডিকেল কলেজেও এসএফআইকে পরাস্ত করে ছাত্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানান এ আই ডি এস ও নেতৃত্ব।

## একটিও আসন পেল না সিটু

*একের পাতার পর*

বন্দর এলাকায় পুরনো ইউনিয়নগুলির পাশাপাশি এ আই ইউ টি ইউ সি-র উদ্যোগে বহুদিন আগে গড়ে উঠেছে 'কলিকাতা-হলদিয়া পোর্ট অ্যান্ড ডক ওয়ার্কার্স ফোরাম'। ফোরামের হলদিয়া শাখার আহ্বায়ক তাপস কুমার চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে বলেন, ফোরাম বন্দর শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত বিশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে চলেছে। তারই ফলশ্রুতিতে কলিকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন ও অন্যান্য ইউনিয়নগুলির মধ্যে এমনকী সিটু ইউনিয়নের মধ্যেও বহু শ্রমিক বুঝতে পারছেন যে ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনের সামনে সিটুই মূল বাধা। তাছাড়া বন্দর এলাকায় হলদিয়া ডক ইন্সটিটিউটও এদের দাপটে অপসংস্কৃতি ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল, কোনও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। ফোরামের মুখপত্র 'বন্দর সমাচার' এ বিষয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের সচেতন করে চলেছে। যার সামগ্রিক পরিণতিতে কলিকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন ও অন্য দুটি ইউনিয়নের সমন্বয়ে হলদিয়া ডক ইন্সস্টিটিউট থেকে একেবারে মুছে গেল 'সিটু', একই সাথে হলদিয়া বন্দরে সিটুর সংগঠন বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ছে।

## জনগণের স্বার্থে রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আন্দোলন চলছে

*ঝাড়খণ্ডে পানীয় জলের দাবিতে দলের নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ ও ডেপুটেশন*

*স্কুল স্তরে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও পাঠ্যপুস্তকের দাবিতে ছাত্রবিক্ষোভ*

# দুর্নীতিবিদ্যায় কংগ্রেস নোবেল পাওয়ার যোগ্য

আর্থিক দুর্নীতিকে ভিত্তি করে জে পি সি (জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি) ঘোষণা এ দেশে নতুন নয়। দুর্নীতিও নতুন কিছু নয়। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারে যাওয়া, মন্ত্রীগিরি করার নামে জনসাধারণের রক্তজল করা সম্পদ লুঠ করাটা জনসেবার মধ্যেই যে পড়ে, স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসী জমানায় থাকতে থাকতে এইটা যেন মানুষের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রবাদে আছে, চুরি ডাকাতি নাকি মহাবিদ্যার মধ্যেই পড়ে, যদি না পড়ে ধরা। নানা দ্বন্দ্বের ফলে মহাবিদ্যাধররা ধরাও পড়ে মাঝে মাঝে। তবে ভয়ের কিছু তেমন থাকে না। আইন আছে, তার ফাঁকও আছে। এই ফাঁকগুলো অপরাধীদের বেরিয়ে যাওয়ার মতো করেই তৈরি করা।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল এক দলীয় সরকার ক্ষমতায় থেকেছে। শোষণের জন্য শাসন যত নির্মম হয়েছে, শাসকদলের প্রতি জনগণের অনাস্থা তত বেড়েছে। পুঁজিবাদী শোষণে লুণ্ঠনে জর্জরিত নিঃস্ব মানুষ প্রায় ক্রয়ক্ষমতাশূন্য অবস্থায় পৌঁছানোর ফলে বাজার সংকট নজিরবিহীন হয়ে উঠেছে। তাই ভোটের সামনে ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জনতার সর্বনাশ করা শাসকদলগুলির আজ রেওয়াজে পর্যবসিত। রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনতার পক্ষে তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার পার্টি বাছাই করে নেওয়াও খুব মুস্কিল। কারণ কোনও পার্টি ভোটের আগে গ্যারান্টি দিয়ে তো বলে না, 'আপনাদের খেতে দেব না, পরতে দেব না, কাজ দেব না, কাজ কেড়ে নেব, ফসলের ন্যায্য দাম দেব না, ন্যূনতম মজুরি দেব না, রোগ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখব না', অর্থাৎ এক কথায় ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব। তাই বোঝা কঠিন হয়। রাজনৈতিক চেতনা ছাড়া সত্য ধরা পড়ে না, স্কুল-কলেজের বিদ্যাতেও নয়। কে মারবে, কেমন করে মারবে, কতটা মারবে তা জনগণের প্রকৃত উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না। তাই মার দেওয়ার পার্টিটাকেই বাছাই করতে হয় ভোটের সময়। কারণ বিকল্প শক্তি তেমনভাবে মানুষের কাছে পরিষ্কার নেই। যারা মারবে, কাটবে তাদেরই পরিচালিত ও প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমের গল্প শুনতে শুনতে বুদ্ধি ঘুলিয়ে গিয়ে যে বিপদ হবার তাই হয়। এই জালিয়াতি কারবার চালাতে গিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীকে শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একাধিক দল খুলতে হয়। যেমন তাদের সর্বভারতীয় দল কংগ্রেস ও বিজেপি। রাজ্যে রাজ্যেও এমন দল আছে। তাই এখন রাজ্যে রাজ্যে জোট সরকার এবং কেন্দ্রেও কখনও কংগ্রেস-জোট, কখনও বিজেপি-জোট সরকার যাওয়া-আসা করছে। কাজেই জনতার সম্পদের লুঠের ভাগটা এখন একা নয়, জোটধর্ম রক্ষা করে ভাগ করে নিতে হয়। এগুলো সহ্য করাটা জনগণের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা ডাকাতি করেছি, বেশ করেছি — এটা শুনতে, মানতে, হজম করতে, এখনও পাঁচ পাবলিকের অভ্যাস হয়নি। সবাই জানে ১৯৮৭-র বফর্স কেলেঙ্কারি, ১৯৯২, ২০০১-এ সিকিউরিটি ও স্টক মার্কেট দুর্নীতি, ২০০৩-এ কীটনাশক দুর্নীতি নিয়ে হৈ চৈ থামাতে জেপিসি হয়েছিল। ফলাফল হয়েছে শূন্য। সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা রক্ষার প্রস্তাব কমিশনের তরফে দেওয়া হয়েছিল। এ এমন এক সরকারি বাণী যা পদদলিত করেই নেতাগিরি ও মন্ত্রীত্ব রক্ষা করতে হয়। যদিও এই জেপিসি-র জন্য জলঘোলা করার রেওয়াজও কংগ্রেসের ঐতিহ্যগত বংশদোষ। নইলে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী জেপিসি-র ঘোষণার জন্য তিন মাস লাগিয়েছিলেন কেন? সে যাই হোক, অতীতের থেকে বর্তমানে পরিবর্তনটা মানতেই হবে — তখন তো ছিল 'একা খাব'। এখন হয়েছে 'সবাই খাব', 'দিয়ে-থুয়ে খাব'। দিয়ে-থুয়ে খেলে অন্যেরা আর তেমন রাগ করে না। দিয়ে-থুয়ে খেলে সেটা ভালোর মধ্যে গণ্য হয়। সেই বিচারে প্রধানমন্ত্রীও ভালো, কংগ্রেসও ভালো, অধুনা প্রধানবিরোধী দল — সেও ভালো! কারণ সরকারি ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে তহলকা দুর্নীতির মতো অনেক দুর্নীতিতে তার তখন হক ছিল, এখন বিরোধী দল, তাই দুর্নীতি নিয়ে হল্লা করতে তাদের হক জন্মেছে। কেন্দ্রে সরকারি রাজস্ব প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা ক্যাগ রিপোর্ট জানালেও স্পেকট্রাম বিলি যেভাবে হয়েছে তা যে কোনও দুর্নীতিই নয়, এই দাবিটা কেউ বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাছাড়া টাকার পরিমাণে ক্ষতিও না কি অত নয়। মাননীয় অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলি মানুষের অসহ্যই মনে হল। তাঁর এক গুণমুগ্ধ ভক্ত বর্তমান টেলিকম মন্ত্রীও বললেন, সরকারের কোনও ক্ষতিই হয়নি। 'জিরো' লস! এসব নিয়ে দীর্ঘ সময় লোকসভা অচল হয়ে থাকল। যাঁরা সংবাদমাধ্যমের মালিক, তাঁরা হিসেব দিলেন, লোকসভার অধিবেশন বন্ধ থাকায় কত টাকার ক্ষতি হচ্ছে। জল ঘুলিয়ে খাওয়ার পর শেষ অব্দি জেপিসি ঘোষণা হল। ইতিমধ্যে প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী কংগ্রেসী জোটের সঙ্গী ডিএমকে নেতা এ রাজা ধরা পড়লেন অভিযুক্ত হয়ে। শিল্পপতি গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় টাটার সঙ্গে এক এজেন্সির টেলিফোন সংলাপের কথা ফাঁস হওয়ায় প্রমাণ পেল, কীভাবে শুধু স্পেকট্রাম নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ফয়দা লুঠতে কোন পার্টির কোন লোককে কোন দপ্তরে বসাতে হবে তা নিয়ে নেতা ও মন্ত্রীদের গোপন কেনাবেচার কাহিনী এবং পরিকল্পিত ছকের হদিশ। আমলা-শিল্পপতি ও সরকারের এক অশুভ চক্রের দেশজোড়া ব্যাপক জাল যে ছড়ানো রয়েছে তা সকলের সামনে এল। সামনে এল অর্থনীতি এবং সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর ওপর আসল নিয়ন্ত্রণ কাদের। মহারাষ্ট্রে আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারিতে, আই-পি-এল ক্রিকেটে সরকার-বিরোধী পক্ষ-আমলা-মিলিটারির উচ্চপদস্থ কর্তারা শিল্পপতি ও প্রোমোটাররা সবাই যুক্ত। কংগ্রেসী নেতা মন্ত্রী সহ মহারথীরাও যুক্ত। কমনওয়েলথ গেমসেও একই দুর্নীতির ছবি। দিল্লির শীলা দীক্ষিত পরিচালিত কংগ্রেসী সরকারও কমনওয়েলথ গেমস নিয়ে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। সবাই জানে দুর্নীতির দরুন বড় বড় বিল্ডিং, ওভার ব্রীজ ভেঙে পড়াটা এদেশে হামেশাই ঘটছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতারা এসব আর্থিক কেলেঙ্কারিতে আকণ্ঠ ডুবে আছে, নিত্য নতুন ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে। ঠিক এমন সময়ে জেপিসি ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন। তাঁর সরকার ও তাঁর সততা প্রমাণের জন্য।

তিনি জোরের সাথে বললেন — স্পেকট্রাম বিলিতে কোনও ক্ষতিই হয়নি। যদিও এক সময় তিনি ক্ষতিটা কমিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বর্তমান টেলিকম মন্ত্রী কপিল সিবালের কথাই তাঁর গলায় শোনা গেল। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, স্পেকট্রাম বিলিতে নিলাম করা হয়নি কেন? প্রধানমন্ত্রী এর উত্তরে বললেন, নিলাম যদি নাই হয়ে থাকে, তবে ক্ষতির হিসাব আপনারা করছেন কী করে? অথচ তথ্য প্রমাণ বলছে যে, আসল ঘটনা হল নিলাম এক ধরনের হয়েছিল। তবে তা সরকারের তত্ত্বাবধানে নয়, কর্পোরেট সেক্টরের ধুরন্ধর ঘনিষ্ঠ চাঁইদের দ্বারা, যারা এর থেকে বিপুল অর্থ কামিয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন, 'আগে এলে আগে পাবার নীতি' এ রাজা গ্রহণ করেছিলেন, তা তিনি জানতেন না। এখানে প্রশ্ন, না জানলে তিনি সাফাই গাইছেন কেন? যদি না জানার কথা সত্য হয়, তবে সেই অপরাধের দায়ই বা নেবে কে? আশ্চর্যের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, স্বচ্ছতা রাখার জন্য টেলিকমের বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে একথা প্রমাণিত। ২০০৭-০৮-এ যখন এ রাজা টেলিকম মন্ত্রী ছিলেন, তখন থেকেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। রাজা সম্পর্কিত সংশয় ও অভিযোগ ছিল তখন থেকেই। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার তাঁকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উনি অত্যন্ত নিকৃষ্ট কিছু কথা বললেন। এক) রাজাকে মন্ত্রীসভায় আনা হবে কি না এটা পুরোপুরি ডিএমকে দলের ব্যাপার। দুই) ২০০৩ সালে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি টেলিকম ও অর্থমন্ত্রকের ওপর ছাড়া হয়েছিল। তিন) লাভ-লোকসানের হিসাবটাও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। যেমন কংগ্রেসী জোট সরকার গরিব মানুষকে খাওয়ানোর জন্য খাদ্যশস্যে ৮০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি, সারে ৬০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি বা কেরোসিনে যে ভর্তুকি দেয়, কেউ বলতে পারে এটা অপচয়! রাজস্ব ক্ষতির প্রশ্ন প্রথমে অস্বীকার করে পরে ভিন্ন দিকে তা ঘুরিয়ে দিতেই তাঁর এই বিচিত্র তুলনা।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবটি নিতান্ত আনাড়িপনাই শুধু নয়, যে কোনও ভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই। তিন নম্বর কথাটি বলা হল অত্যন্ত সুচিন্তিত প্রতারণার উদ্দেশ্যে। কোটি কোটি টাকার মালিক তথা ধনীগোষ্ঠীদের বাড়তি অর্থ পাইয়ে দিয়ে সরকারি কোষাগার তথা পাবলিক ফান্ড দুর্বল করা, আর গরিব মানুষকে একটু খাদ্য সংস্থানের জন্য পাবলিক ফান্ড থেকে ভর্তুকি দেওয়া — এক মানদণ্ডে বিচার হতে পারে না। এই তুলনা তাই অজ্ঞতা নয়, ধূর্তামি। কর্পোরেট গোষ্ঠীকে ভর্তুকি আর দেশের মানুষের খাদ্য, জ্বালানি, সার, চিকিৎসা, শিক্ষায় ভর্তুকি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে কোনও সৎ মানুষ, যার মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র দরদবোধ আছে। অবশ্য উদাহরণ হিসাবে এমন তুলনা আনার মধ্য দিয়ে ধনকুবের গোষ্ঠীকে তোষণ করার শ্রেণীপ্রবৃত্তির আসল রূপটাই বেরিয়ে পড়েছে। গ্লোবাল হাংগার ইনডেক্স অনুযায়ী, ৮৪টা দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৬৭ নম্বরে। এতদ্‌সত্ত্বেও গত বাজেটে খাদ্য ভর্তুকি থেকে ৪৫০ কোটি টাকা ছাঁটাই করা হয়েছিল। এবারও খাদ্য ও গণবণ্টনে কমানো হয়েছে ৬৪১৫.০৭ কোটি টাকা। সারে ভর্তুকি কমানো হয়েছে ৫০০০ কোটি টাকা। যে প্রধানমন্ত্রী ৮০ হাজার কোটি টাকা খাদ্য ভর্তুকি নিয়ে স্পেকট্রাম দুর্নীতির আর্থিক ক্ষতির পক্ষে সাফাই গাইছেন, গত

> প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে চুরি করলেন কি না, অর্থের ভাগাভাগিতে বখরা নিলেন কি না এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বিষয় হল, সরকারের প্রধান হিসাবে সমস্ত দুর্নীতির দায় তাঁকে নিতেই হবে।

বাজেটে তাঁরা ৫ লক্ষ কোটি টাকা ধনীদের, কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলোকে আর্থিক ছাড়, অর্থাৎ ভর্তুকি দিয়েছেন। মাত্র তিনটি খাতে এই বিপুল ছাড়। প্রত্যক্ষ কর, কাস্টম, এক্সাইজ ডিউটি। এই বিপুল পরিমাণ টাকা ধনীদের ভর্তুকির পাশে খাদ্য, সার বা কেরোসিন, চিকিৎসার সামান্য ভর্তুকির কোনও তুলনাই হয় না। এই টাকা স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির অর্থের অন্তত আড়াই গুণ। শুধু ব্যক্তিগত আয়করের পরিমাণেই ছাড় দেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। মনে রাখা দরকার, যত টাকা ধনীরা ছাড় পায় তত টাকা সাধারণ মানুষের ঘাড় ভেঙে কর চাপিয়ে আদায় করে নেওয়া হয়। যেমন বাজেটে দেখানো হয়েছে প্রত্যক্ষ কর ছাড় ১১,৫০০ কোটি টাকা। প্রায় সমপরিমাণ পরোক্ষ কর ১১,৩০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। এই পরোক্ষ কর আমজনতার ঘাড় ভেঙে আদায় করা হবে। আর বর্তমান বাজেটে গরিবদের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাত থেকে গতবারের তুলনায় ২০ হাজার কোটি টাকা ছাঁটাই করা হয়েছে। বাজেট পর্ব শেষ করেই বাড়ানো হল কয়লার দাম। পেট্রল-ডিজেলের দাম বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই সাতবার বেড়েছে। আবার বাড়তে চলেছে। এটা এখন বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলেও শুল্ক ও সেস বসিয়ে বাড়তি মুনাফা তোলায় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কোনও ক্লান্তি নেই। এ রাজ্যের সিপিএম সরকারও তা করে থাকে। এই সব বাস্তবতার সামনে প্রধানমন্ত্রীর যুক্তিসংগত কোনও জবাবই দেওয়ার থাকে না। তাই তাঁর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সম্পূর্ণ কোণঠাসা ও বিপর্যস্ত হয়ে শেষপর্যন্ত অত্যন্ত ছেঁদো কথা ও আরও অসত্য কথাই বলে বসলেন। দুর্নীতির সাথে রফা করেই তিনি সরকার চালাচ্ছেন। দুর্নীতিকে আড়াল করছেন। এমনকী তাঁর সরকারে তিনি 'এক ঠুঁটো জগন্নাথ' — এসব শোনার পর দিশেহারা প্রধানমন্ত্রীর জবাব — তিনি "সম্পূর্ণ নির্দোষ"। তিনি আরও বললেন, 'কেন্দ্রে সরকার একদলীয় নয়, বহুদলীয়। জোট সরকার চালাতে গিয়ে এমন আপস রফা করতেই হয়।' রাজার মন্ত্রীত্ব, রাজার স্পেকট্রাম বিলি, রাজাকে দ্বিতীয়বার মন্ত্রীত্বে আনা, সরকারি রাজস্ব ক্ষতির দায় — সব অস্বীকার করে তিনি বললেন, জোট সরকার চালানোর দায়বদ্ধতার জন্যই এমন সব ঘটনা সহ্য করতে হয়েছে। দুর্নীতির সঙ্গে আপস করতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যুক্তি, তথ্য, প্রশ্নের সামনে জোট ধর্মের অজুহাত খাড়া করে বাঁচতে চাইলেও বাঁচাতে পারলেন না। তাঁকে মানতে হল — দুর্নীতির সঙ্গে বোঝাপড়া করেই জোট সরকারকে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর মিথ্যাচারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রশ্ন এসে গেল — আদর্শ আবাসন, কমনওয়েলথ গেমস, আইপিএল সহ একাধিক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত কংগ্রেসী নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তিনি কি কোন আপসহীন রাস্তা নিয়েছেন? নাহলে কেন নেননি? আসলে যেমন করে ডিএমকে-র রাজাকে লালন-পালন করেছেন, তেমনি করে কংগ্রেসীদেরও করেছেন। তাহলে যে তিনি জোট ধর্মের জন্য দুর্নীতির সঙ্গে আপস করতে হয়েছে বললেন, তা দুরভিসন্ধিমূলক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং বলা যায় কংগ্রেসী হোক, ডিএমকেই হোক, তিনি দুর্নীতির প্রশ্নে রফা করে 'দল-নিরপেক্ষ' দৃষ্টি নিয়ে চলেছেন। মাঝখানে নানা তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া ও পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের চাপ ও প্রচার মাধ্যমের সোরগোলের সামনে পড়েই দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়েছে, কারণ না নিয়ে উপায় ছিল না। সবটাই তিনি চেপে যাচ্ছিলেন। এখন নিরুপায় হয়ে তিনি সৎ, নির্ভীক, সাহসী প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে এবং কংগ্রেসকেও একটা সৎ দুর্নীতিবিরোধী দলের তকমা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, কোনও দুর্নীতিবাজ রেহাই পাবে না। বশংবদ নেতারা কলঙ্কিত সরকার ও তার নেতা প্রধানমন্ত্রীকে মহান বানাতে বললেন — জেপিসি ঘোষণা এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির মুখোমুখি বসার প্রতিশ্রুতি সহ প্রধানমন্ত্রী যা করলেন, তহলকা কেলেঙ্কারির পর বিজেপির প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারীও তা পারেননি। যা হল তা নজিরবিহীন। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে চুরি করলেন কি না, অর্থের ভাগাভাগিতে বখরা নিলেন কি না এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বিষয় হল সরকারের প্রধান হিসাবে সমস্ত দুর্নীতির দায় তাঁকে নিতেই হবে। এদিক থেকে তিনি চরম নীতিহীন, অপরাধী। শুধু ডিএমকের রাজার কথাই নয়। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিলাসরাও দেশমুখ। সারা দেশের গ্রামীণ উন্নয়নের হর্তাকর্তা বিধাতা এই মন্ত্রী সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির দায়ে অপরাধী হওয়ায় আদালতের নির্দেশে মহারাষ্ট্র সরকারকে ১০ লাখ টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদে আসীন কেন? কারণ কংগ্রেস চেয়েছে, প্রধানমন্ত্রী চেয়েছেন। এমন উদাহরণ আরও তুলে ধরা যায়। তাহলে জোটের স্বার্থেও নয়, এমনকী

*সাতের পাতায় দেখুন*

# কংগ্রেসের দুঃশাসনের দলিল

## কংগ্রেসের অবদান ঃ স্বাধীন ভারতে ক্ষুধা মানুষের নিত্যসঙ্গী

২০০৭ সালের ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে রিপোর্ট থেকে জানা যায়, প্রতি হাজার খেতমজুর পরিবারের মধ্যে ২৩৩টি পরিবার বছরে কয়েক মাস অর্ধাহারে থাকে।

গ্রামের অ-কৃষি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যেও মরসুমি অর্ধাহার প্রতি হাজার পরিবারে ৪৭টি।

প্রতি হাজার পরিবারের মধ্যে এ রাজ্যে ১০৬টি (১০.৬ শতাংশ) পরিবার কয়েক মাস আধপেটা খেয়ে থাকে। এই সংখ্যা ওড়িশায় ৪.৮ শতাংশ, ছত্তিশগড়ে ২.৬ শতাংশ, বিহারে ২ শতাংশ, আসামে ১.৭ শতাংশ, কেরলে ২.২ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ১.৪ শতাংশ। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মে ২০০৭)।

**রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত ক্ষুধাপীড়িত ৮৮টি দেশের তালিকার মধ্যে ভারতের স্থান ৬৬ নম্বরে। আর মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী ১৮২টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৭ নম্বরে।**

রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট পরিষ্কার বলেছে, ভারতের ৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ বা ৫৫ শতাংশ ভারতীয় হচ্ছে অতিদরিদ্র।

কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ২০ টাকার কম।

সুরেশ তেন্ডুলকর কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ৪০ শতাংশ মানুষ রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। এই দারিদ্র্যের সীমানা কী? যারা দৈনিক ২১০০ ক্যালোরি শক্তিদায়ক খাদ্যশস্য, যার আর্থিক মূল্য মাত্র ১৪ টাকা, সেটুকুও জোটাতে পারে না, তারাই দারিদ্রসীমার নিচে। ১৯৭০ সালের মূল্যসূচক ধরে এই মূল্যায়ন। বর্তমান মূল্যসূচক ধরলে এই টাকায় ১৫০০ ক্যালোরির বেশি খাবার জুটবে না। ইংরেজ আমলে মাথাপিছু মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০০ কেজি, আজকে তা দাঁড়িয়েছে ১৪২ কেজিতে। দেশের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ সুষম আহার থেকে বঞ্চিত। প্রতি বছর শুধুমাত্র পেটের অসুখে ২০ লক্ষ মানুষকে ঝরে যেতে হয়। বছরে এদেশে দেড় কোটি মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়, তার মধ্যে ৫ লক্ষ মানুষের ঠিকানা পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে যায়।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সহ আটটি রাজ্যের অবস্থান আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত ২৬টি দেশের চেয়েও খারাপ। আয়ের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং পরিষেবার অবস্থা ধরে নির্মিত নতুন দারিদ্র্য সূচক অনুযায়ী ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪২.১ কোটি। আর আফ্রিকার ঐ ২৬টি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সংখ্যা ৪১ কোটি।

## প্রসূতি ও শিশু মৃত্যু

দেশের মোট শিশুদের অর্ধেকই অপুষ্টিতে আক্রান্ত। এখানে প্রতি ১০০০টি সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে সরকারি হিসাবেই মারা যায় ৫৪টি শিশু। দেশে প্রতি বছরে জন্ম হওয়া শিশুদের মধ্যে মারা যায় মোট ২১ লক্ষ। সরকারি টিকাকরণ কর্মসূচির হালও অত্যন্ত খারাপ। অসংখ্য শিশুর মৃত্যু হয় এমন সব রোগে, প্রতিষেধক টিকা দিয়ে যেসব রোগ থেকে অতি সহজেই তাদের বাঁচানো যেত।

দেশে প্রসূতি মায়েদের প্রায় ৬০ শতাংশ এবং সদ্যোজাত শিশুদের ৭৪ শতাংশই রক্তাল্পতার শিকার। প্রশিক্ষণহীন দাই-এর দ্বারা প্রসব করানো হয় ৫২ শতাংশ মাকে। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে এ দেশে এখনও এক লক্ষের মধ্যে মরতে হয় ২৬৫ জন প্রসূতিকে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মহিলাদের একটা বড় অংশ অপুষ্টিতে আক্রান্ত। ৩৬ শতাংশ ভারতীয় মহিলার ওজন প্রয়োজনের তুলনায় কম। প্রতি লক্ষ প্রসূতি মায়ের মধ্যে ৩০১ জন মারা যান। উন্নত দেশে এই সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ জন মাত্র। রুগ্ন এইসব মায়েরা যে রুগ্ন সন্তানেরই জন্ম দেবেন, এ আর আশ্চর্য কী!

## উন্নয়ন শুধু ধনীদেরই

বিশ্বের সেরা ধনীদের তালিকা প্রকাশকারী ফোর্বস পত্রিকা বিশ্বের ৫২ জন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিকদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় ২০ জন সেরা ধনীর মধ্যে ছয় জনই ভারতের। এ দেশের ৩৭ জন কর্পোরেট প্রধানের মধ্যে কালানিধি মারান বেতন পান ৩৭ কোটি টাকা এবং অনিল আম্বানি ৩০ কোটি টাকা।

## হায় রে বাজার অর্থনীতি!
## গরিবকে দু'মুঠো খেতে দিলে বাজার নাকি ধসে পড়ে

কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতায় দেশজুড়ে এফ সি আই গুদামে বিশাল পরিমাণ চাল, গম প্রতি বছরই পচে নষ্ট হচ্ছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্যে এ বছর ২১৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য পচে নষ্ট হয়েছে। এর বেশিরভাগটাই রাখা হয়েছিল অযত্নে অবহেলায় খোলা আকাশের নিচে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী শরদ পাওয়ার এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন ২০০৭-'০৮ সালে ৯২৪ টন গম ও ৩২ হাজার ৬১৬ টন চাল, ২০০৮-'০৯ সালে ৯৪৭ টন গম ও ১৯ হাজার ১৬৩ টন চাল এবং ২০০৯-'১০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২ হাজার ১০ টন গম ও ৩ হাজার ৮০ টন চাল পচে নষ্ট হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, সরকারের এই স্বীকৃতি আসলে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। যে দেশে বহু মানুষ দু'বেলা ভরপেট খেতে পায় না, সে দেশে শাসকদের এই সচেতন অপচয় কি গণহত্যার সমতুল্য অপরাধ নয়? প্রচলিত আইনের বিচারে যাই বলুক, মানবতার বিচারে এ হল নিকৃষ্টতম অপরাধ।

এই অপচয়ের বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, গুদামে পচিয়ে নষ্ট না করে সেই খাদ্য গরিবদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করে দেওয়া হোক। কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, এটি নিছকই পরামর্শ। সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে এটিকে 'নির্দেশ' বলে ঘোষণা করলে মাঠে নামেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সব গরিব মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া সম্ভব নয়। এমনকী গরিব মানুষকে খাদ্য দেওয়ার দায় এড়াতে কোর্টের এক্তিয়ার নিয়েই তিনি প্রশ্ন তোলেন। একে বিচারব্যবস্থার অতিসক্রিয়তা বলে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, সরকারি কাজকর্মে বিচারব্যবস্থার নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। পণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী তত্ত্ব করে এমনও বলেন, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিলি করলে কৃষকরা আরও বেশি ফসল উৎপাদনের উৎসাহ পাবেন না।

## অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের শেষ সম্বল পেনশন কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত

নয়া পেনসন সিস্টেম গত প্রায় সাত বছর ধরে চালু রয়েছে। ২০০৩ সালে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রের এনডিএ সরকার একটি কনট্রিবিউটারি পেনসন স্কিম তৈরি করেছিল ১.১.২০০৪-এর পর নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য। এই স্কিম ২০০৪ সালে কার্যকর করেছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। এই সরকার তখন পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল সিপিএম এবং তার সহযোগী দলগুলির উপর। এরপরে বিভিন্ন দল পরিচালিত ২৭টি রাজ্য সরকার তার কর্মচারীদের জন্য এই স্কিম চালু করে।

এই স্কিম অনুযায়ী পেনসন, কর্মচারীদের কোনও অধিকার নয় বা নিয়োগকর্তাদের কোনও দায় নয়। কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার প্রদেয় অর্থ পেনসন ফান্ড ম্যানেজারদের কাছে জমা দিতে হবে। এই ম্যানেজারদের মনোনীত করবে পেনসন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পিএফআরডিএ)। এটি একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা — যা প্রথমে এনডিএ সরকার গঠন করেছিল এবং পরে ২০০৪ সালে অর্ডিন্যান্স মারফৎ পুনর্গঠন করেছিল ইউপিএ সরকার। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এটি তার কার্যকারিতা হারায়। কিন্তু বিধিসম্মত না হওয়া সত্ত্বেও এই সংস্থা বিগত ৬ বছরের বেশি সময় ধরে পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এবং ২০০৪ সাল থেকে সঞ্চিত পুরো পেনসন ফান্ডকে শেয়ার বাজারে খাটানোর পুরো এক্তিয়ার তাকে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই বেআইনি সংস্থাটিকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২৪ মার্চ ২০১১ লোকসভায় একটি বিল এনেছে। এই সংস্থাটি পেনসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় যেমন দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে, তেমনই দেশি-বিদেশি ফাটকাবাজদের সামনে উন্মুক্ত পেনসন বাজারটিরও নাকি বিকাশ ঘটাবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পেনসন আর অধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে না। ফলে কর্মচারীরা আদৌ পেনসন পাবেন কি না, পেলেও তার পরিমাণ কী হবে — সমস্তটাই নির্ভর করবে শেয়ার বাজারের ফাটকাবাজির উপর, যা অত্যন্ত অস্থিতিশীল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চূড়ান্ত নির্লজ্জভাবে সরকার এই স্কিমকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠিত আপসকামী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক নেতৃত্বের সাহায্য নিয়ে পি এফ আর ডি এ-র কাজের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজনটি হল ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র, যেখানে সিপিআই (এম) ও সিপিআই নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনগুলি অন্যদের সাথে নিয়ে নবম দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে সই করেছে, যার ফলে কর্মচারীদের নির্দিষ্ট পেনসন পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। এই পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক।

এই পরিস্থিতিতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা সরকারের এই শ্রমিক বিরোধী, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থবাহী ষড়যন্ত্র, যা সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত ধারণার মূলে আঘাত করেছে, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে, বিশেষত সরকারি কর্মচারীদের এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ও এই কালা বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

## আত্মহত্যায় দেশ এগোচ্ছে

১৯৯৭ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ সাধারণ চাষি আত্মহত্যা করেছে। এই ভয়াবহ সংখ্যাটা ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার জানিয়েছিলেন। ২০০৬ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৬০ জন। ২০০৮ সালে ১৬ হাজার ১৯৬ জন চাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল।

## কংগ্রেসী শাসনে কালো টাকার রমরমা

- গত লোকসভা নির্বাচনের আগে নানা মহল থেকে দাবি করা হয়েছিল, বিদেশের ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের ১.৪ লক্ষ কোটি ডলার কালো টাকা মজুত আছে। টাকার অঙ্কে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৬৩ লক্ষ কোটি টাকা। এ তথ্য 'সুইস ব্যাঙ্কিং অ্যাসোসিয়েশনে'র রিপোর্ট থেকে পাওয়া।
- 'সুইস ব্যাঙ্কিং অ্যাসোসিয়েশনে'র রিপোর্ট বলছে, ২০০৬ সালে সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের আমানতের পরিমাণ ছিল ১.৪৫৬ লক্ষ কোটি ডলার। ২০০৮-এর রিপোর্টে এই টাকার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১.৮৯১ লক্ষ কোটি ডলার। অর্থাৎ দু'বছরে আমানতের পরিমাণ বেড়েছে ৪৪ হাজার কোটি ডলার।
- সারা বিশ্ব থেকে যত টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা হয়, তার অর্ধেকের বেশি ভারতের। বিশ্বে কালো টাকার সবচেয়ে বড় উৎপাদক হল ভারত।
- কালো টাকা নিয়ে গবেষণার কাজ করেছে 'গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি' নামের একটি সংস্থা। ২০১০-এর নভেম্বরে তাদের গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, 'দ্য ড্রাইভার্স অ্যান্ড ডাইনামিক্স অব ইলিসিট ফিনান্সিয়াল ফ্লোজ ফ্রম ইন্ডিয়া ঃ ১৯৪৮-২০০৮' এই নামে। সেই রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের মোট কালো টাকার পরিমাণ ৬৪০০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ১৭৮০০ কোটি ডলার (২৭.৮ শতাংশ) রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে। বাকি ৪৬২০০ কোটি ডলার (৭২.২ শতাংশ) জমা হয়েছে বিদেশে। অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৬১ বছরে প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা দেশ থেকে গোপনে পাচার হয়েছে বিদেশে। ২০০৮ সালে ভারতের জিডিপির পরিমাণ ছিল ১.২৮ লক্ষ কোটি ডলার। অর্থাৎ ভারতের জিডিপির অর্ধেকের সমান তার কালো টাকা। আর যে পরিমাণ কালো টাকা বিদেশে মজুত হয়েছে তার পরিমাণ জিডিপির ৪০ শতাংশের সমান এবং টু-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতিতে লোপাট অর্থের ১২ গুণের সমান।
- লক্ষণীয় বিষয়, ১৯৪৮ সাল থেকে যে ৪৬২০০ কোটি ডলার বিদেশে জমা হয়েছে তার অর্ধেকই পাচার হয়েছে ১৯৯১ সালে উদারনীতি চালু হওয়ার পর থেকে। আর এক তৃতীয়াংশ পাচার হয়েছে ২০০০ থেকে ২০০৮ সালে। ২০০৪ থেকে ২০০৮ সালে অর্থাৎ ইউ পি এ সরকারের আমলে পাচার হয়েছে ৯৬০০ কোটি ডলার। ২০০৯ সালে বিশ্বের মোট কালো টাকায় ভারতের অংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪.২ শতাংশ।
- **এই বিপুল পরিমাণ কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করে ভারত যদি দেশে ফিরিয়ে আনতে পারে তাহলে তার অর্ধেক দিয়ে সমস্ত বিদেশি ঋণ (২৩০০০ কোটি ডলার) শোধ করে দিতে পারে।**

# সিপিএমের অপশাসনের দলিল

## বেকারি, ছাঁটাই, মালিক তোষণের ইতিহাস

৩৫ বছরের শাসনে সিপিএম একটি বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সেটি হল শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোবল ভেঙে দেওয়ার অপচেষ্টা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মজুরিদাসত্ব থেকে মুক্তি নেই, এই বোধ থেকে শ্রমিকদের মধ্যে যতটুকু সংগ্রামী চেতনা ছিল এবং তাকে ভিত্তি করে কারখানায় কারখানায়, শ্রমিক মহল্লায় আন্দোলন যতটুকু হত, বামফ্রন্ট সেটাকে অনেকাংশেই মেরে দিয়েছে। শ্রমিকদের সংস্কার নির্ভর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। সংগ্রাম নয়, সিপিএম সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করার মন্ত্র তারা শ্রমিকদের কানে ঢুকিয়েছে, শ্রমিকদের মধ্যে সুবিধাবাদ আমদানি করার চেষ্টা করেছে। তার ফলে সংগ্রামী সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। মালিকী শোষণে শ্রমিকদের জীবন জেরবার। কেমন আছেন রাজ্যের দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকরা সিপিএম জমানায়?

* রেকর্ড গড়া সিপিএম সরকার রাজ্যবাসীকে উপহার দিচ্ছে প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকার ঋণ, কমবেশি ৮৪ লক্ষ বেকার যুবক।
* রাজ্যে নথি ও অনথিভুক্ত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা ১ লাখ ১৩ হাজার ৮৪৬। দেশের মোট রুগ্ন সংস্থার ৪৬.৬ শতাংশ অর্থাৎ ২৯,২১৫টি সংস্থা বন্ধ। কাজ নেই প্রায় তিন লাখ মানুষের।
* রাজ্যের জনসংখ্যা ৮ কোটি ২ লক্ষ। কাজ করে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষ। এর মধ্যে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে যেখানে বাঁচার মতো মজুরি নেই, নেই কাজের নিরাপত্তা।
* ৭৩ লক্ষ খেতমজুর, ১০ লক্ষ ইটভাটা শ্রমিক, ১৫ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক, ১১ লক্ষ নির্মাণ শ্রমিক ও আরও অসংখ্য অসংগঠিত শ্রমিক সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত।
* সারা দেশের মধ্যে শ্রমিক সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়। লেবার কোর্টের সংখ্যা মাত্র ১১টি। বছরের অর্ধেক সময় জজ সাহেব থাকেন না। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন পার্টটাইম কাজ করেন। বিহারে লেবার কোর্ট আছে ১৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৩১টি, গুজরাতে ৫৪টি।
* রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে প্রায় ৩০০টি ব্লকে মিনিমাম ওয়েজেস ইন্সপেক্টর আছেন এবং বিডিওরা আছেন। অথচ ন্যূনতম বেতন না দিলে আইনে জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োগের কথা কখনও শোনা যায়নি।
* বিভিন্ন রাজ্য মানলেও, এই রাজ্যে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা হয় ২২০০ ক্যালোরি ধরে, পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ মেনে ২৭০০ ক্যালোরি ধরে নয়। বহুদিন পর হঠাৎ সরকার ঘোষণা করেছেন ২৭০০ ক্যালোরি ধরা হচ্ছে।
* এই রাজ্যে ৫৯ ধরনের পেশাতে সরকার ন্যূনতম বেতন ঘোষণা করলেও বহু পেশাতে মালিকপক্ষ কোর্টে গিয়ে পাঁচ থেকে পঁচিশ বছর ধরে স্থগিতাদেশ নিয়ে রেখেছে। সরকার নীরব দর্শক। শ্রমিক বঞ্চিত।
* সরকার নির্ধারিত মজুরির হিসাব (শতাংশ) —

| রাজ্য | গ্রাম | শহর |
|---|---|---|
| গুজরাট | ৮৩ | ৫৪.৪ |
| মহারাষ্ট্র | ৭৮ | ৪০ |
| ওড়িশা | ৯০ | ৭৬ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ৩০.১ | ৩০.৪ |

* সম্প্রতি ঘোষিত সরকার নির্ধারিত মাসিক মজুরি —

| | অদক্ষ শ্রমিক টাকা | আধাদক্ষ শ্রমিক টাকা | দক্ষ শ্রমিক টাকা |
|---|---|---|---|
| দিল্লি | ৫২৭২ | ৫৮৫০ | ৬৪৪৮ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ৩৬৭১ | ৩৬৯৭ | ৩৮২৩ |

* শ্রমিকদের পিএফ বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। ইএসআই বকেয়া ২৩০ কোটি টাকা। চটশিল্পে শ্রমিকদের শুধু গ্র্যাচুইটি বাবদ বকেয়া ২৫০ কোটি টাকা। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষে অবস্থান করছে বহু বছর।
* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবে শ্রমিক সংখ্যার ২৯ শতাংশ ঠিকা শ্রমিক।
* বহুল প্রচারিত সেক্টর ফাইভে কাজ করতে হয় ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা। প্রথমে বলা হয়েছিল ইউনিয়ন করা যাবে না, তারপর ইউনিয়ন হয়েছে বা আছে কিন্তু মাইনে, কাজের সময় ও ছাঁটাই নিয়ে গাছের পাতাও নড়েনি। নড়তে দেওয়া হয়নি।
* পুঁজিপতিদের সহায়তা করার জন্য শ্রমিকের আইনি অধিকারগুলিকে বিভিন্ন কৌশলে খর্ব করে বিভিন্ন প্রকল্পের দাওয়াই দেওয়া চলছে।
* বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা মাথাপিছু উৎপাদন অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিকদের থেকে অনেক বেশি করছেন। মজুরি পাচ্ছেন অনেক কম। চলছে উলট পুরাণ — কাজের সময় বাড়ছে, মজুরি কমছে।
* হাওড়া, দুর্গাপুর, হলদিয়া এবং দিল্লি রোডের দু'পাশের কারখানাগুলিতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করছেন। প্রায় সবাই ঠিকা শ্রমিক। মালিকরা এখানে প্রচলিত ১২টি শ্রম আইনের কোনওটাই মানে না। এর দায় রাজ্য সরকারের। শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বহু ক্ষেত্রেই লেবার সাপ্লায়ার। সরকার দাবি করছে শিল্পে শান্তি আছে। শ্রমিকরা জানেন, এ শ্মশানের শান্তি।
* পশ্চিমবঙ্গে বন্ডেড লেবার বা বাঁধা শ্রমিক, পেট-ভাতা শ্রমিক ও শিশু শ্রমিক ব্যবস্থা অবাধে চলছে। এ লজ্জা কার?
* ১৯৯৪-২০০৫ সালের মধ্যে চালু শিল্পে দুর্ঘটনার সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৯১। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬৮৫ জন শ্রমিকের। ২৯,৮৭৩ জন শ্রমিক স্থায়ী প্রতিবন্ধী। গড়ে বছরে ২৯০০ জন শ্রমিক এই তালিকাভুক্ত হচ্ছেন।
* সরকারের সংস্থা 'ওয়েবকন' ২০০২ সালে ৪০২টি রুগ্ন ও ৯৮টি বন্ধ কারখানায় সমীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছে যে, এই সব কারখানার মোট জমির পরিমাণ ৪১ হাজার একর। সরকার বাটা ইন্ডিয়ার ২৬২ একর উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করে চলতি বাজারদর ১৫০ কোটি টাকার পরিবর্তে মাত্র ১২ কোটি টাকায় বাটাকেই বিক্রি করেছে। হিন্দুস্থান মোটরস-এর ৩১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করে মাত্র সাড়ে ১০ কোটি টাকায় তা আবার হিন্দুস্থান মোটরসকে বিক্রি করা হয়েছে।
* শিল্পের জমিতে শিল্প হবে ঘোষণা করে বহু কারখানার জমি নিয়ে আবার প্রায় বিনামূল্যে মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর এই জমিতে দ্রুত মুনাফার জন্য রমরমিয়ে তৈরি হচ্ছে বহুতল আবাসন। যেমন কলকাতার ঊষা ফ্যাক্টরির জমিতে হয়েছে সাউথ সিটি মল ও আবাসন। তারা পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও বিধিনিষেধ মানে না। কিন্তু তাদের ঠেকায় কে?
* পুঁজিবান্ধব সরকার কার স্বার্থ দেখছে, তা আজ আর আড়ালে নেই। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টকে 'সংগ্রামের হাতিয়ার' করার স্বপ্ন নিয়ে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের যা অবস্থা হয়েছিল, রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের আজ একই অবস্থা।

(তথ্যসূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন, ৫ এপ্রিল ২০১১ )

## মাধাই হালদারের আত্মাহুতি জ্বালিয়ে ছিল প্রতিবাদের দীপশিখা

১৯৯০ সাল। মূল্যবৃদ্ধি-বাসভাড়া বৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত মানুষের জীবন। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস সিপিএমের হাতে রাজ্যপাট সঁপে দিয়ে 'তুমি বাংলা আমি দিল্লি'র মধুর সমঝোতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। কে করবে প্রতিবাদ? কংগ্রেস তো আন্দোলনের, প্রতিবাদের শক্তি নয়। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু কলকাতাকে বলতেন, 'মিছিল নগরী', 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। মিছিলের বজ্রনির্ঘোষে চমকে উঠত কংগ্রেস। সে আন্দোলন ভাঙে, লাঠিগুলি চালায়, আনন্দ হাইত-নুরুল ইসলামকে শহিদ বানায়। এই অবস্থায় বাংলার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ধারণ করে আন্দোলনের ডাক দেয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

৩১ আগস্ট বিকেল বেলা। রানি রাসমণি রোডে মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি রোধের দাবিতে হাজার হাজার মানুষ সুশৃঙ্খল মিছিল করে ঢুকছেন। পুলিশ চালাল গুলি। রক্তপতাকা হাতে নিয়ে লুটিয়ে পড়লেন ১৮ বছরের কৃষক সন্তান কমরেড মাধাই হালদার। গুলিবিদ্ধ হলেন আরও ৩২ জন এস ইউ সি আই(সি) কর্মী-সমর্থক। আন্দোলনে এই গুলি বর্ষণ রাজ্যের মানুষকে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল, তার চেয়েও বেশি আঘাত করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ। ঐদিন সকালে '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্তম্ভে মালা দিয়ে বিকালেই এসপ্লানেড ইস্টে সিপিএমের সভায় জ্যোতি বসু আইন অমান্যে পুলিশের গুলি ও মাধাইয়ের মৃত্যুর সংবাদে বলেছিলেন, নিরামিষ আন্দোলনকে আমিষ করা হল। এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা কি বামপন্থী বাংলা বরদাস্ত করতে পারে? প্রতিবাদে ৩ সেপ্টেম্বর ডাকা হল বাংলা বনধ। তা সর্বাত্মক সফল হল। এই প্রথম মানুষ দেখতে পেলেন বাংলায় সিপিএমই শেষ কথা নয়। এই বনধ মানুষকে ভরসা দিয়েছিল। মানুষ দেখতে পেলেন প্রতিবাদ আজও মরেনি। কমরেড মাধাই হালদার জীবন দিয়ে বাংলার প্রতিবাদী সংস্কৃতির ঝান্ডা উড়িয়েছেন। আজ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আত্মদানের অগ্রদূত বিপ্লবী কর্মী কমরেড মাধাই হালদার লাল সেলাম।

## সি পি এম রাজত্বে হোসিয়ারি কর্মীরা ন্যূনতম মজুরিও পান না

রাজ্যে এখন হোসিয়ারি ইউনিটের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটা প্রায় দ্বিগুণ। প্রায় ৭০ শতাংশ কারখানাই ছোট। এতেই বেশিরভাগ লোক কাজ করেন। এঁরা দরিদ্র, অর্ধভুক্ত, অথচ দক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। এঁদের দক্ষতার গুণেই শিল্পটি চলছে।

দেশের ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী এই শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হওয়া উচিত মাসে ৭হাজার টাকা। বহু টালবাহানার পর 'শ্রমিকদরদি' এই সরকার তাঁদের ন্যূনতম মজুরি ধার্য করেছে মাত্র ৪৩০০ টাকা। আবার কাগজেকলমে চালু করলেও এই মজুরিটুকুও নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরও তারা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মজুরি নির্ধারণ করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ওয়েজ বোর্ড গঠন করার কথা। এই রাজ্যে ওয়েজ বোর্ড হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। মাঝের দুটি পর্যায়ে ওয়েজ বোর্ড গঠন করার প্রয়োজন বোধ করেননি শাসকদলের কর্তারা। বিগত ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশও কার্যকর করেনি অধিকাংশ মালিক।

কলকাতা ও হাওড়ার ছোট ইউনিটগুলিতে একবার পা দিলেই দেখা যায় প্রায়ান্ধকার ঘুপচি ঘরে অবর্ণনীয় অবস্থায় কাজ করছেন শ্রমিকরা। কাজের নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা নেই। প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানার কর্মীই সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরিটুকুও পান না। ই এস আই, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন কিছুই এখানে নেই। শ্রমিকদের দেওয়া হয় না কোনও পরিচয়পত্র। কারখানাতে নেই কোনও শৌচাগার। দিনের পর দিন এই অবস্থা চলছে। প্রায় ৯০ শতাংশ মালিক শ্রম আইন মানে না। শ্রম আইন ভাঙার জন্য কোনও মালিকদের শাস্তিও হয়নি।

প্রায় ৩৫ বছরের শাসনে সিপিএম উপহার দিয়েছে দুটি শিল্পনীতি, ১৯৭৭ এবং ১৯৯৪ সালে। প্রথম শিল্পনীতিতে বলা হয়েছিল বেকারি আটকানো, কর্মসংস্থান বাড়ানো, ছোট ও কুটির শিল্পে পুঁজির চাপ কমানোর কথা । কোনও ক্ষেত্রেই ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি ওই পর্বে। বরং এই পর্বেই একচেটিয়া ও বিদেশি পুঁজিকে রাজ্যে শিল্প গড়তে ঢালাও আমন্ত্রণ জানানো হল। দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে চট, বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে চলতি কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য উপযুক্ত প্রস্তাব রচনার কথা বলা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানোর কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

(সংবাদ সূত্র ঃ বর্তমান, ৫ এপ্রিল ২০১১)

# গণআন্দোলনের স্বার্থে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের জয়ী করুন

*একের পাতার পর*

সিপিএমকে সরকার থেকে সরানো দরকার। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থেই এই পরিবর্তন অবশ্যপ্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ জন্য আমরা বলছি, সিপিএম মাস্ট গো।

আবার, এ কথাও ঠিক এবং আমরাও মনে করি, শুধুমাত্র সরকার পরিবর্তনের দ্বারা এই সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয়। ১৯৫২ সাল থেকে ভারতবর্ষে লোকসভা, বিধানসভা থেকে শুরু করে নানা স্তরে বহু নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, সংকট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভোটে সরকার পরিবর্তন করা যায় কিন্তু এই পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা পাল্টানো যায় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে দলই সরকারে যাক তাদের বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার রাজনৈতিক কাঠামোর বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করতে হয়। যেকোনও দল, এমনকী আমাদের দলও যদি সরকার গঠনের সুযোগ পায়, হয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও অত্যাচারী শক্তি, না হয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও অত্যাচারিত জনগণের যেকোনও এক পক্ষের স্বার্থে সরকার পরিচালনা করতে হবে। আর এই ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে সরকার পরিচালনা করতে গেলে সেই সরকারকে পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতা থেকে যেকোনও প্রকারে সরিয়ে দেবে, সরকারে তাকে থাকতে দেবে না। যদি কোনও দল ভোটে জিতে সরকারে গিয়ে সততার সাথে সরকার চালাতে চায়, তা হলে তারা বড় জোর চুরি-দুর্নীতি বন্ধ করতে পারে, সাধারণ মানুষকে কিছু রিলিফ দিতে পারে, জনগণের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে পারে, প্রশাসনকে খানিকটা নিরপেক্ষভাবে চালাতে পারে, গণআন্দোলনকে পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে সরকারে থেকে সাহায্য করতে পারে, এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের দলও ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারে মন্ত্রীত্বে ছিল। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আমাদের দল গণআন্দোলন ও জনগণের স্বার্থে সরকার পরিচালনার জন্য সংগ্রাম করে গেছে। মাত্র কয়েক মাস সে সরকার ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু ওই অল্প সময়েই পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল — 'ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ চলবে না'। প্রবীণ মানুষরা জানেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত এই নীতিতে আতঙ্কিত বুর্জোয়াশ্রেণী যুক্তফ্রন্টকে সরকারি ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। যার জন্য ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সিপিএম বুর্জোয়াদের এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, 'এবার বামফ্রন্টে এস ইউ সি আই নেই।' ১৯৭৭ সাল থেকে সরকারে থেকে বুর্জোয়াদের সেবা করতে গিয়ে সিপিএমকে জনস্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়েছে। সত্যিই যদি জনগণের স্বার্থে কোনও সরকারকে কিছু করতে হয় তাহলে গণআন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব অর্থাৎ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত দেওয়া, সাহায্য করা এবং ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনকে পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে লড়তে হবে। সরকারে থেকে এই কাজ না করলে সে সরকারকে জনগণের উপর দমন-পীড়নের রাস্তাই নিতে হয়, না হলে সে চলতে পারে না, যা সিপিএম ৩৪ বছর ধরে করে চলেছে।

*নির্বাচনী প্রচারে কুলতলি কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার*

*১০ এপ্রিল দক্ষিণ বারাসাত থেকে জয়নগর পর্যন্ত মিছিল ৮ কিলোমিটার পদযাত্রা*

এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জনগণের দাবি যতটুকু আজ পর্যন্ত আদায় হয়েছে তা গণআন্দোলনেরই জোরে। ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকেই গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আমাদের দল জনগণের নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে দলের কর্মীরা পুলিশের লাঠি-গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছে। '৯০ সালে মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে কিশোর কমরেড মাধাই হালদার সিপিএম সরকারের পুলিশের গুলিতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছে। জনসমর্থনের ভিত্তিতে একা দাঁড়িয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল ১৮ বছর লড়াই করে প্রাইমারিতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা চালু করিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর কোনও দাবিতে এ দেশে এত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন হয়নি। পাশ-ফেল চালু এখনও পর্যন্ত আমরা করাতে পারিনি। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর শেষে বিকল্প পরীক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারিভাবে শিক্ষাবিদদের নিয়ে কমিটি করে আমাদের দল চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। ভারতের ইতিহাসে এ রকম দ্বিতীয় ঘটনা নেই। আমরা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, ছাত্রদের ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, শ্রমিক-কৃষকের নানা দাবিতে কত লড়াই একা করে গেছি, আমরা এককভাবে জনগণের সমর্থনে ১৫ বার বাংলা বনধ করেছি। কিছু কিছু দাবিও আদায় করতে পেরেছি। আমাদের দল ছাড়া কোনও দল এভাবে দাবি আদায় করতে পারেনি। আর এই আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে। আমাদের দলের রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, তেভাগা আন্দোলনের প্রবীণ নেতা কমরেড আমির আলি হালদার সহ ১৫৮ জন নেতা-কর্মীকে সিপিএম খুন করেছে, সাজানো মামলায় ৯ বারের বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ ৪৯ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, ১১০০ জনের উপর জামিন অযোগ্য ধারায় খুনের মিথ্যা অভিযোগে মামলা করেছে। সকলেই জানেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন আমাদের দলই শুরু করেছিল, পরে তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেওয়ায় আন্দোলন সফল হয়। লালগড় আন্দোলনেও আমরা প্রথম থেকেই ছিলাম। গোটা পর্বে সিপিএমের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ায় কংগ্রেস আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছে, বিজেপির ভূমিকাও একই ছিল।

পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণকে দীর্ঘায়িত করতে পুঁজিপতিশ্রেণী অর্থনৈতিক আক্রমণ এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়নের চেয়েও ভয়ঙ্কর আক্রমণ হানছে মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য, নৈতিক বলকে খতম করে দেওয়ার জন্য। পুঁজিবাদ চায় মানুষকে অমানুষ কর, লোভী কর, স্বার্থপর কর। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা দেশের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগাবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং-মাষ্টারদা সূর্য সেন-প্রীতিলতা-আসফাকউল্লা প্রমুখ স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবীদের এবং রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-প্রেমচন্দ প্রমুখ মানবতাবাদী মনীষীদের স্মরণ দিবস উদযাপন করি। এঁদের জীবন সাধনা ও চরিত্র থেকে মহৎ উপাদানগুলি সংগ্রহ করে আজকের সমাজের আরও জটিল সংকট সমাধানের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত পথনির্দেশের অর্থাৎ মার্কসবাদের রূপায়ণ চরিত্রে ঘটাতে হবে। তবেই উন্নত চরিত্র ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বর্তমান যুগের বিপ্লবী তৈরি হবে। তাই বিগত যুগের বড় মানুষরা আজও আমাদের জ্বলন্ত প্রেরণার উৎস। এঁদের সামনে রেখেই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেশের ছাত্র-যুবকদের নতুন মনুষ্যত্বের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। দেশের যৌবনকে আহ্বান জানিয়ে তিনি তাই বলেছিলেন, যতদিন বাঁচবে, কুকুর বেড়ালের মতো বেঁচো না। যতদিন বাঁচবে, বাঁচবে মানুষের মতো। আর যদি মানুষের মতো বাঁচতে ও মরতে চাও তবে তার একটাই মাত্র পথ — বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করা। এই শিক্ষা বুকে নিয়েই আমাদের দল এগিয়ে চলেছে, লড়াই করছে, পুলিশের গুলির সামনে নেতা-কর্মীরা বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছে, হাসিমুখে কারাবরণ করছে।

এখানে বলা দরকার, সিপিএমের ৩৪ বছরের রাজত্বের অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, মালিকশ্রেণীর দালালি, গণআন্দোলনের উপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ — এ সব দেখে অনেক সৎ বিবেকবান মানুষ বামপন্থার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তাঁদের কাছে আবেদন করি, সিপিএমকে দেখে বামপন্থার থেকে মুখ ফেরাবেন না। ৩৪ বছর ধরে যা ওরা চর্চা করেছে তার সাথে বামপন্থার কোনও সম্পর্ক নেই। বামপন্থার নামে ক্ষমতায় এসে ওরা নিকৃষ্ট দক্ষিণপন্থী রাজনীতিরই জাবর কেটেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন রাজনীতির চর্চার মধ্য দিয়ে এ দেশে বামপন্থী রাজনীতির জন্ম হয়েছিল। দেশের জন্য সর্বস্ব সমর্পণই ছিল সে রাজনীতির প্রাণ, স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন সে রাজনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, কংগ্রেসী ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে এই রাজনীতি আরও পুষ্ট, আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই অসীম আত্মত্যাগকে ভাঙিয়ে সিপিএম নেতারা দখল করেছেন মন্ত্রীত্বের গদি এবং তারপর এতদিনকার বামপন্থী আদর্শকে হত্যা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা সংগ্রামী বামপন্থার সুমহান পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। সংগ্রামী এই রাজনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমরা আবেদন জানাই।

এবারের নির্বাচনে সিপিএমের ৩৪ বছরের অপশাসনের অবসান ঘটানোর সুবর্ণ সুযোগ জনসাধারণের কাছে হাজির হয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সিপিএম মরিয়া চেষ্টা করবেই। মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার, প্রোপাগান্ডা পাওয়ার সবই ওদের আছে। ওদের পিছনে আছে প্রশাসনের সক্রিয় মদত। ওদের সাথে আছে কংগ্রেসের গোপন বোঝাপড়া। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এ কথা জানেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের সিট দেওয়ার বিষয়ে পশ্চিমবাংলার জনগণ যে ক্ষোভ ও আবেগ প্রকাশ করেছেন এবং দুঃখ পেয়েছেন তাতে আমরা অভিভূত। এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। কিন্তু আমরা সিপিএম-এর অপসারণ চাই, এ কারণেই আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থন করছি। সাধারণভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থন করলেও কিছু প্রার্থী সম্পর্কে আমাদের আপত্তি আছে, যাঁরা সিপিএম রাজত্বে আমলা ও পুলিশের কর্তা ছিলেন, এস ই জেড-এর প্রবক্তা ছিলেন। এই সকল প্রার্থীদের সমর্থনে আমাদের দলের কর্মীরা প্রচারে নামবে না। আমরা এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে জয়নগর এবং কুলতলীতে প্রার্থী দিয়েছি এবং আরও ২৯টি আসনে সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপির বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছি। এই সমস্ত আসনে গণআন্দোলনের স্বার্থে এবং বামপন্থাকে রক্ষা করতে সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপিকে পরাস্ত করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের **টর্চ চিহ্নে** ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আবেদন জানাচ্ছি।

### উইকিলিকসের ফাঁসে সিপিএম

# মার্কিন কর্তার কাছে উদারনীতির পক্ষে সওয়াল করে ‘ডাও’কে আহ্বান করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী

মার্কিন অর্থসচিব হেনরি পলসনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বৈঠক উইকিলিকসে ফাঁস হয়ে গিয়ে সিপিএম সম্পর্কে বহুজনের বিভ্রান্তি কাটাতে সাহায্য করেছে। বৈঠকটি হয়েছিল ২০০৭ সালের অক্টোবরে মহাকরণে। সেদিন পলসনকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আগামী দিনে সকলকে আর্থিক উদারবাদের পথেই হাঁটতে হবে। তিনি বলেছেন, এই পরিবর্তিত আর্থিক পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের সংস্কার সমর্থন করতেই হবে। আর না হলে মুছে যেতে হবে।

ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পলসনের কাছে আবেদন করেন যাতে মার্কিন সংস্থাগুলি এ রাজ্যে আরও বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, তিনি চান, ডাও কেমিকেল রাজ্যের কেমিকেল হাবে বিনিয়োগ করুক।

এই বৈঠকের কথা ফাঁস হতেই মহা মুশকিলে পড়ে গিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাঁদের এই দহরম-মহরম দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেই বহু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এ বারের নির্বাচনে সিপিএম-বিরোধী প্রবল জনমতের সামনে দলের কর্মী-সমর্থকরা নজিরবিহীন অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। এই দুরবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সিপিএম নেতারা তাঁদের সামনে মার্কিন ষড়যন্ত্রের আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছিলেন। ব্যাপারটা যেন এমন যে, সিপিএম দল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা আপসহীন লড়াই চালাচ্ছে, বামপন্থার পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছে, আর সেই সব রুখতে প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের সরকার থেকে ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। উইকিলিকসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ফাঁস হওয়ার পর এই গল্প যেমন দলের কর্মীরা আর বিশ্বাস করবেন না, তেমনই সাধারণ মানুষ, যাঁরা ভোট রাজনীতির এত প্যাঁচ-পয়জার ধরতে পারেন না, সিপিএমের পতাকার লাল রঙ, নামের পাশে মার্কসবাদী লেখা, আর নেতাদের গরম গরম বুলি শুনে দলটিকে বামপন্থী এবং গরিব মানুষের দল বলে মনে করতেন, তাঁরাও সিপিএমের অবামপন্থী, মার্কিন-ভজা চরিত্রটি সহজে ধরতে পারবেন। সিপিএমের ধুরন্ধর নেতারাও এ ব্যাপারে খুব ভয় পেয়েছেন, তাই তড়িঘড়ি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে ‘আমি এমন বলিনি’, ‘আমার কথা বিকৃত করা হয়েছে’, ‘কিছু অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে’ ইত্যাদি বলে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

বিষয়টিকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বলেছেন, ‘‘বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নীতির গরিব-বিরোধী পরিণামগুলি থেকে শ্রমজীবী জনতাকে রক্ষা করতে আমাদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।’’ এ যেন সুকুমার রায়ের ‘খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না’ — প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকছি, আবার তার বিরোধিতাও করছি! আসলে তাঁরা যে উদারীকরণ নীতির সমর্থক এবং সরকারে বসে সেই নীতিকেই কার্যকর করছেন, এ কথাটি তাঁদের উচ্চারণ করা চলে না। কারণ তা হলে তাঁদের বামপন্থার ভড়ংটুকু আর থাকে না। আর এই ভড়ংটুকু না হলে ভোটে জেতা যাবে না। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ নীতির গরিব-বিরোধী পরিণামগুলি থেকে শ্রমজীবী জনতাকে কীভাবে তাঁরা ‘রক্ষা’ করেছেন? মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশই নন্দীগ্রামে ইন্দোনেশিয়ার কুখ্যাত সালিমদের স্বার্থ রক্ষা করতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কৃষকদের হত্যা করেছে, তাঁর দলেরই ভাড়াটে ক্রিমিনালরা মহিলাদের ধর্ষণ করেছে। সিঙ্গুরে ভারতীয় বহুজাতিকের শিরোমণি টাটাদের কারখানার জন্য জমির দখল নিতে চাষিদের উপর যে অত্যাচার তাঁরা নামিয়ে এনেছিলেন তা দেখে শিউরে উঠেছিল গোটা দেশ। মুখ্যমন্ত্রী কুখ্যাত মার্কিন বহুজাতিক ডাও-এর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, যারা ভোপালে ৮,০০০ মানুষের মৃত্যু এবং প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের পঙ্গুত্বের জন্য দায়ী।

আসলে সিপিএম বরাবরই মুখে বামপন্থার কথা বলেছে, আর বাস্তবে পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের পরিচালিত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে গেছে। তাই সোনিয়া গান্ধী অনায়াসেই বলতে পারেন বামপন্থীদের (সিপিএমের) সাথে কাজ করতে তিনি অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এটিও উইকিলিকসেই ফাঁস হয়েছে। কিছুদিন আগেই সিপিএম সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটের বৈঠকের কথা ফাঁস হয়েছিল, যেখানে তিনি পরমাণু চুক্তি নিয়ে তাঁদের লাইন ব্যাখ্যা করেছিলেন মার্কিন কর্তাদের কাছে। তাই সাড়ে তিন দশক এ রাজ্যে শাসন চালিয়ে যেতে পুঁজিপতিদের দিক থেকে সিপিএমকে তাদের কোনও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি, মার্কিনি বিরোধিতা তো অনেক দূরের ব্যাপার। আজ মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এবং একের পর এক দলের শীর্ষ নেতাদের সাথে মার্কিন কর্তাব্যক্তিদের বৈঠকের খবর ফাঁস হওয়াতে মানুষ আর কোনও ষড়যন্ত্রের গল্পই বিশ্বাস করছে না।

# এ দেশে ভোটও একটা লাভজনক ব্যবসা

*তিনের পাতার পর*

রাজার দ্বিতীয়বার মন্ত্রীত্বে নিয়োগ ডিএমকের বিষয় বলেও নয় — যা করা হয়েছে জেনেবুঝেই করা হয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চরম বাজার সংকট, যা স্থায়ী রূপ পেয়েছে, সেই শোষণমূলক সংকটগ্রস্ত বাজার অর্থনীতিকে রক্ষা করতে যে দলই চাইবে, দক্ষিণপন্থার কথা বলে হোক, গান্ধীবাদ বা মার্কসবাদের স্লোগান তুলে হোক, সে দলই দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে যাবে। সর্বভারতীয় দল হোক, আঞ্চলিক দল হোক, কোনও পার্টি রক্ষা পাবে না। নেতারাও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। কারণ পুঁজিবাদ নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত। এই দুর্নীতির ব্যবস্থা রক্ষণাক্ষেণের দায়িত্ব নিলে দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়ে উপায় নেই।

বিশ্বজোড়া সংকটের সামনে পড়ে বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বেসরকারিকরণের আওয়াজ তুলেছে। বলছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, পরিবহন, বীমা, ব্যাঙ্ক, সর্বক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ চাই। সাম্প্রতিক পুঁজিবাদী মহামন্দার সংকটের সময় দেখা গেল, বেসরকারিকরণের প্রবক্তারাই সরকারি তহবিলের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বেসরকারি কর্পোরেটদের রক্ষা করতে তাদের পকেটে ঢালছে, অর্থনৈতিক ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করছে। ভারত সরকারও করেছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করে — পাবলিক ফান্ড মালিকদের পকেটে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যেমন টাটার ন্যানোর জন্য গাড়ি পিছু ৩০ হাজার টাকা ভর্তুকি দিয়ে গাড়ির দাম এক লাখ টাকা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সিপিএম সরকার। এই সরকারেরও দুর্নীতির সীমা নেই। ইতিমধ্যে দুর্নীতি দমন বিভাগ কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনের সর্বোচ্চ পদে দিল্লিতে নিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও দুর্নীতির যে অভিযোগ ছিল তা আবার সামনে এসেছে। এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ শেষপর্যন্ত এমন জায়গায় গেল যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সিভিসি পদে টমাসের নিয়োগ বাতিল করতে বলল। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকার তিরস্কৃত হল। প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় এই নিয়োগের সব দায় নিজে স্বীকার করে বিবৃতি দিলেন। অপকর্ম ধরা পড়ার পর বাধ্য হয়ে আবারও তাঁকে একই-ভাবে ‘দক্ষ’, ‘সৎ’ ও ‘নির্ভীক’ প্রধানমন্ত্রী হতে হল!

প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রেও সবই জানতেন। জেনেই নিয়োগ মেনে নিয়েছিলেন। বেসরকারিকরণের বর্তমান স্তরে লোকসানের জ্বালা পাবলিকের, লাভের গুড় মালিকদের। আগে বিভিন্ন সংস্থার ওপর সরকারের যতটুকু বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ কাজ করত তার দ্বারা দুর্নীতির ওপর সরকারের যেটুকু নিয়ন্ত্রণ চলত, প্রশাসনের যেটুকু সততা, স্বচ্ছতার ছিঁটেফোঁটা রক্ষা করা সম্ভব হত বেসরকারিকরণের ফলে আজ সেটুকুও লুপ্ত। শুধু প্রধানমন্ত্রীই নয়, হাইপাওয়ার মন্ত্রী পি চিদাম্বরমও বলছেন, ‘প্রশাসনের স্তরে নৈতিকতার অবনমন হয়েছে’, তবে বক্তারাও যে ব্যতিক্রমী নন, একথাটাও বলা প্রয়োজন ছিল। মহাবিদ্যার ধরা পড়ার মাহাত্ম্যে এত ভালো কথা শোনা গেল। স্পেকট্রাম শুধু নয়, খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবন-জীবিকার প্রধান ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারি মালিকগোষ্ঠীদের কব্জায় তুলে দেওয়া হচ্ছে। আইনি লুণ্ঠনের ব্যবস্থার পাশাপাশি বেআইনি লুণ্ঠনের ব্যাপকতা ও তীব্রতাও বেড়েছে। খাদ্য সুরক্ষা দেওয়া হবে নাকি ৭৫ ভাগ মানুষকে। নেহাৎ দেওয়া যাচ্ছে না — দেশে ঐ প্রয়োজন মেটাতে যত খাদ্যশস্য দরকার তা রক্ষার গুদাম নেই। করতে লাগবে চার বছর। কাজেই খাদ্য সুরক্ষা হবে না। কেন্দ্রের ফাটকাবাজ নেতা ও মন্ত্রীদের কথাই এরকম। লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য পচে গেল, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিল বিনা পয়সায় গরিব অভুক্ত মানুষকে তা বিলিয়ে দিতে। প্রধানমন্ত্রী-কৃষিমন্ত্রী শুনে মুচকি হাসলেন। সরকারি উত্তর হল খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় খাদ্য পচে নষ্ট হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ভাষায় এই ‘অপরাধ’-এর যারা অপরাধী তাদের শাস্তি কি হল? যাদের অবহেলায় হয়ত কত শত মানুষ অনাহারে মারা গেল সেই হত্যাকারীদের শাস্তি হল না কেন? গণবণ্টনের খাদ্যের বড় অংশ চোরা পথে বাজারে বিক্রি হয়। কারা করে? কতজনের শাস্তি হয়েছে? যারা খাদ্য নষ্ট করল, যারা আদালতের নির্দেশ শুনল না, তাদের কী শাস্তি হল? কংগ্রেস সরকার, স্বয়ং সৎ, নির্ভীক প্রধানমন্ত্রী ঐ দুষ্কর্মের সঙ্গে আপস করেননি?

ভারতের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশে কালোবাজারি অর্থনীতির জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের নেটওয়ার্ক, আইনি পথে(!) জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া, পাবলিক ফান্ডের টাকা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবায় ঢালা, সরকারি ক্ষমতা বা পদকে সে ব্যাপারে কাজে লাগানো বর্তমান যুগের সংকটগ্রস্ত বাজার অর্থনীতিরই প্রতিফলন। অর্থনীতি সংকটগ্রস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত বলে এর উপর কাঠামো হিসাবে রাজনীতি দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বাজার অর্থনীতির পণ্য হিসাবে নিকৃষ্ট রাজনৈতিক নেতার জন্ম দিচ্ছে। জন্ম দিচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলের — হোক জাতীয় বা আঞ্চলিক দল, হোক তা দক্ষিণপন্থী বা তথাকথিত বামপন্থী। এই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির রক্ষকদের পরিণতি এমনটা হতে বাধ্য। তাই সরকার গড়ার সময়, কেন্দ্র বা রাজ্যে অনাস্থা প্রস্তাব এলে এমপি-এমএলএ কেনাবেচা হয়। মুনাফা কামানোর রেসকোর্সে পার্টি হচ্ছে ঘোড়া, নেতা-মন্ত্রীরা ঘোড়ার জকি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দেখিয়েছে, বহুদলীয় গণতন্ত্রের এই বৃহত্তম দেশে ভোটও একটা ব্যবসা যা লাভজনক। লক্ষ কোটির বেশি কালো টাকা এই ভোট ব্যবসায়ে বিনিয়োগ হয়, ভবিষ্যৎ মুনাফার জন্য। জনপ্রতিনিধিরা কোটি কোটি টাকার মালিক। ভোটে টাকা খাটায়, পরে কামায়।

লেনিন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই কলুষতার বাইরে দেশে দেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী পার্টি, যারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে ভাঙতে চায়, কায়েমী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে, একমাত্র তাদের মধ্যেই আজ উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান রাজনীতি, চরিত্র, নৈতিকতার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির এই বৈশিষ্ট্য আছে। আর সাম্রাজ্যবাদের যুগে মেকি বামপন্থীদের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ। ইতিহাসে সুবিধাবাদ ও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ হাতে হাত মিলিয়েই চলে। মহান লেনিনের এই শিক্ষাকে ভুললে চলবে না। লেনিন দেখিয়েছেন, ‘‘সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যদি সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত না হয় তাহলে সেটা হয় একটা ফাঁকা ও মিথ্যে বুলি’’ (সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, লেনিন নির্বাচিত রচনাবলী, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)। এই জন্য কংগ্রেস-সিপিএমের বোঝাপড়া কখনও প্রকাশ্য কখনও গোপন। এই জন্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সিপিএমের নিকৃষ্ট ভূমিকা নিয়ে পুঁজিপতিদের এসইজেড পরিকল্পনা রূপায়ণ। এইজন্যই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রেক্ষাপটে সিপিএমকে কংগ্রেসের নিঃশব্দে সমর্থনও বোঝা যায়। এইজন্যই গ্রিনহান্টে তাদের হাতে হাত। এজন্যই কংগ্রেসের জোটের পাশে কেন্দ্রে সিপিএম-সিপিআইকে দেখা গিয়েছে। এইজন্য দেশজোড়া রাজীববিরোধী আন্দোলনের সময় সিপিএম নেতা প্রয়াত জ্যোতি বসু বলেছিলেন, ‘রাজীব গান্ধীর কোনও বিকল্প নেই।’ এজন্যই ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রগতিশীল ভূমিকা তাঁরা দেখেছিলেন, এজন্যই জরুরি অবস্থার ২০ দফা কর্মসূচিতে ছিল তাঁদের সমর্থন। কেন্দ্রের শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, শিল্প, কৃষি, বিদ্যুৎনীতির কার্বনকপি হিসাবে সর্বক্ষেত্রে সিপিএম সরকারের রাজনীতির মডেল এই কারণেই। লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষার ভিত্তিতে এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে রুখতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেমন সর্বব্যাপক লড়াই চাই তেমনি তার দোসর সিপিএমের নির্লজ্জ সুবিধাবাদী পুঁজিতোষণ নীতির সমাপ্তি ঘটাতে তাকেও ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে হবে, তার প্রভাব খর্ব করতেই হবে। আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণমুখী পরিবর্তনের এটাই প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে হলে শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার মিলনের শক্তি সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে খতম করতে হবে। ভুললে চলবে না পার্টি, পার্টির নেতা, দেশের ইতিহাস, দেশের অর্থনীতি-রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতি, দেশের জনগণ এ সব কিছুই একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার ফল। ইতিহাস-পরীক্ষিত সমাজবিজ্ঞান অনুসরণ করেই সুস্থ মহৎ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা ও দেশের সর্বাত্মক পরিবর্তন সম্ভব। কংগ্রেস-নেহেরু-মনমোহন সিং-চিদাম্বরমরা হোন, বিজেপি-অটলবিহারী-আদবানিরা হোন, সিপিএম-জ্যোতিবাবু-বুদ্ধবাবুরা হোন — এই প্রক্রিয়ার বাইরে এঁরা কেউ নেই, এঁরা কেউ ছিলেন না, কেউ থাকবেন না। এঁদের অবলুপ্তির পথে বিপ্লব অনিবার্য। নির্বাচনকেও তার আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া হিসাবেই গড়ে তুলতে হয়।

## হাসপাতাল রক্ষার আন্দোলনে সিপিএমের হামলা

২৭ মার্চ যাদবপুরে বাঘাযতীন ও বিজয়গড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে আন্দোলনরত মানুষদের উপর সিপিএম এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা যেভাবে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত বলেন, পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সরকার যেভাবে হাসপাতালটির একাংশ তিন বছর আগে ব্যানবক্স নামক ব্যবসায়ী সংস্থাকে বিক্রি করেছে সেই একই প্রক্রিয়ায় আর একটি অংশও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে চিকিৎসা পরিষেবা কিনতে হবে মোটা টাকা দিয়ে, যা মধ্যবিত্ত-গরিব মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। হাসপাতালটি বিক্রি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ও কয়েকটি সংগঠনকে নিয়ে কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12



ডানলপ

# তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের চাপে পিছু হঠল শিল্পপতি রুইয়া

হুগলির সাহাগঞ্জে ডানলপ কারখানায় মালিক পবন রুইয়া ২ এপ্রিল রাতে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে লে-অফের নোটিস ঝোলালেও এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে শ্রমিকদের তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়ে তিন দিনের মাথায় ফের তা খুলতে বাধ্য হল।

এ দেশের প্রাচীনতম ডানলপ টায়ার কারখানাটি বেশ কয়েকবার হাত বদলের পর ২০০৬ সালের এপ্রিলে আয়কর ফাঁকির আসামী পবন রুইয়ার মালিকানায় আসে। সেই সময় এই কারখানার উদাহরণ দেখিয়েই সিপিএম এ রাজ্যে শিল্পায়নের ঢল নেমেছে বলে ব্যাপক প্রচারের ঢাক পিটিয়েছিল। মালিকানা হাতে নিয়েই রুইয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর নানা রকম অন্যায় জুলুম চালাতে শুরু করে। কথায় কথায় ছাঁটাই করা, শ্রমিকদের পি এফ, ই এস আই, কো-অপারেটিভের টাকা লোপাট করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য তৈরি হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথে চলতে থাকে একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভাঙা। শুধু তাই নয়, রুইয়া এমনকী ডানলপ কারখানার ভিতর থেকে দামী যন্ত্রপাতি, মোটর, লোহা ইত্যাদি বিক্রি করে দিতেও বাকি রাখেনি। এদিকে কারখানার শ্রমিকদের সমর্থন থাক না থাক, দীর্ঘদিন ধরেই ডানলপ কারখানায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে মালিক ঘেঁষা দুটি মাত্র ইউনিয়ন — আইএনটিইউসি এবং সিটু। কারখানার ভিতরে যথার্থ সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন এ আই টি ইউ সি-র কাজ করার অধিকার নেই। রুইয়ার মালিকানায় আসার পরেও ডানলপে এ চিত্র পাল্টায়নি। এই অবস্থায় ২০০৮-এর নভেম্বরে রুইয়া সিটু ও আইএনটিইউসি-র নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে কারখানা লে-অফ করে দেয়। সেবারেও প্রবল শ্রমিক আন্দোলনের চাপে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কারখানা খুলতে বাধ্য হয়েছিল কর্তৃপক্ষ। আন্দোলনের ময়দানেই শ্রমিকদের কাছে সিটু এবং আইএনটিইউসি সংগঠন দুটির শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী আসল চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়া সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে।

সম্প্রতি একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। এ আই ইউ টি ইউ সি নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনের সহকারী সম্পাদক কমরেড শ্রীকৃষ্ণ পাল দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে অন্যায় ভাবে সাসপেন্ড হয়ে ছিলেন। সাসপেন্ড অবস্থায় কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁর ন্যায্য পাওনা কিছুই মেটায়নি। সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে মালিক রুইয়া শ্রীকৃষ্ণ পালের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বঞ্চিত শ্রমিকের দাবি আদায়ের এই ঘটনা ডানলপের শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ঠিক এর পরে পরেই কাঁচামালের চড়া দাম, তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অজুহাত তুলে রুইয়া গত ২ এপ্রিল আবার লে-অফের নোটিস দিয়েছিল। বলা বাহুল্য অনুমোদিত দুই ইউনিয়ন সিটু এবং আইএনটিইউসি-র মদত না পেলে ও ক্ষমতাসীন সিপিএম সরকারের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন না থাকলে রুইয়ার পক্ষে এই বেআইনি পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হত না। এই অবস্থায় হঠাৎ লে-অফের নোটিস দেখে সিটু-আইএনটিইউসি-মালিক ও সরকারের দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষিপ্ত এবং সহকর্মী শ্রীকৃষ্ণ পালের দাবি আদায়ের ঘটনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকরা কারখানা গেটের বাইরে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে সংগঠিত হতে থাকে। মালিকের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে সারাদিন ধরে চলতে থাকে বিক্ষোভ। এলাকা গমগম করতে থাকে উচ্চকিত স্লোগানে। ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা এলাকায় বিশাল মিছিলও সংগঠিত করে। শ্রমিকদের জঙ্গি মনোভাব এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে তাদের জেদি ও হার না মানা আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় পবন রুইয়া। তুলে নেওয়া হয় লে-অফের নোটিস। সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই যে মালিকের অন্যায় জুলুম বন্ধ করার একমাত্র গ্যারান্টি, ডানলপের ঘটনায় আবার তা প্রমাণিত হল।

# হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, সম্প্রতি রাজ্য সরকার কলকাতা মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো উন্নত না করে এবং উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য পোস্ট না বাড়িয়ে এমবিবিএস-এ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কলকাতা মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ বিভাগ সহ পর্যায়ক্রমে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগকে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের সাথে জুড়ে দেওয়ার সরকারি পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মেডিকেল কলেজের সমমানের পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও এই সরকারি সিদ্ধান্ত অনৈতিক এবং চিকিৎসা পরিষেবার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা অভিযোগে জানিয়েছেন, এনআরএস হাসাপাতালে এন্ডোস্কোপি কোলোনোস্কোপির মতো অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় দীর্ঘদিন ধরে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এবং ডাক্তাররা তা বারবার স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। এই ঘটনাটি আবারও প্রমাণ করে এ রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কোন তলানিতে এসে ঠেকেছে।

# ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলকে কর মকুবের সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাল এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ খেলা থেকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) যে বিপুল অর্থ লাভ করেছে, তার একটা বড় অংশকে আয়করের হিসাব থেকে বাদ দিয়ে প্রায় ৪৫ কোটি টাকার কর মকুব করার যে অন্যায় সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছে, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করছি। দেশের মানুষ যখন অনাহার ও অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে, হাজার হাজার কৃষক যখন ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণ মেটাতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে, সরকার যখন বিপুল বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে দেদার ঋণ করে যাচ্ছে এবং সরকারি ব্যয় কমাবার অজুহাতে নানা সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ ও ভর্তুকি ছাঁটাই করছে, তখন এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, আই সি সি-র মতো একটি বিপুল ধনবান আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কর মকুব করা হল। সংবাদে প্রকাশ, আই সি সি এবার ভারতে বিশ্বকাপ থেকে বাড়তি রাজস্ব হিসাবে ৯০৫ কোটি টাকা ছাড়াও নানা সংস্থাকে খেলার সম্প্রচারের অধিকার দিয়ে আয় করেছে ১০৬৬ কোটি টাকার মতো। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে, দেশের গরিব ও নিঃস্ব জনগণ প্রতিদিন অধিকতর রিক্ততায় নিমজ্জিত হলেও এই সরকার কোষাগার থেকে ধনী ও সম্পদশালীদের সাহায্য দিতেই দায়বদ্ধ।

কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের এই ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

# এস ইউ সি আই (সি)-র প্রার্থীদের জয়ী করুন

| কেন্দ্র | জেলা | প্রার্থী |
|---|---|---|
| মেখলিগঞ্জ (তপঃ) | কোচবিহার | কমরেড প্রমীলা রায় |
| সিতাই (তপঃ) | ঐ | কমরেড অনিলচন্দ্র বর্মন রায় |
| আলিপুরদুয়ার | জলপাইগুড়ি | কমরেড অভিজিৎ রায় |
| জলপাইগুড়ি (তপঃ) | ঐ | কমরেড হরিভক্ত সরদার |
| গোয়ালপোখর | উঃ দিনাজপুর | কমরেড দুলাল রাজবংশী |
| রায়গঞ্জ | ঐ | কমরেড সনাতন দত্ত |
| করণদিঘী | ঐ | কমরেড মুকতার আহমেদ |
| ফাঁসিদেওয়া (তপঃ উপঃ) | দার্জিলিং | কমরেড ভোলা তির্কি |
| গাজোল (তপঃ) | মালদহ | কমরেড গৌতম সরকার |
| সূতি | মুর্শিদাবাদ | কমরেড সামিরুদ্দিন |
| সমসেরগঞ্জ | ঐ | কমরেড টিপু সুলতান |
| জঙ্গিপুর | ঐ | কমরেড মীর্জা নাসিরুদ্দিন |
| রানিনগর | ঐ | কমরেড আবুল আক্তার |
| ডোমকল | ঐ | কমরেড বাইজিদ হোসেন |
| রঘুনাথগঞ্জ | ঐ | কমরেড ডাঃ রবিউল আলম |
| মুর্শিদাবাদ | ঐ | কমরেড গুলশেনারা ইভা |
| বাদুড়িয়া | উঃ ২৪ পরগণা | কমরেড নুরুল আমিন মণ্ডল |
| কুলতলী (তপঃ) | দঃ ২৪ পরগণা | কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার |
| জয়নগর (তপঃ) | ঐ | কমরেড তরুণ নস্কর |
| বাসন্তী (তপঃ) | ঐ | কমরেড বৈদ্যনাথ বর |
| ক্যানিং (পূর্ব) | ঐ | কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ |
| সবং | পঃ মেদিনীপুর | কমরেড নারায়ণ অধিকারী |
| খড়গপুর সদর | ঐ | কমরেড সুরঞ্জন মহাপাত্র |
| বাঘমুণ্ডি | পুরুলিয়া | কমরেড বিসম্বর মুড়া |
| পাড়া (তপঃ) | ঐ | কমরেড শিবানী বাউরি |
| তালডাংরা | বাঁকুড়া | কমরেড কবিতা সিংহবাবু |
| কোতুলপুর (তপঃ) | ঐ | কমরেড মোহন সাঁতরা |
| কাটোয়া | বর্ধমান | কমরেড অপূর্ব চক্রবর্তী |
| আউসগ্রাম (তপঃ) | ঐ | কমরেড মনসা মেটে |
| হাসন | বীরভূম | কমরেড অমল মণ্ডল |
| নলহাটি | ঐ | কমরেড রফিকুল হাসান |

**সিপিএম-ফ্রন্ট, কংগ্রেস ও বিজেপিকে পরাস্ত করুন**

**গণআন্দোলনের স্বার্থে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের**

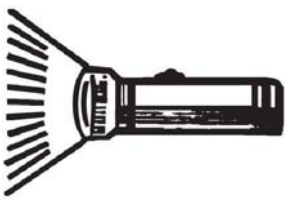

**এই চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন**

**২৪ এপ্রিল**

## এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

## ৬৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

**কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে**

# সমাবেশ

ভারতসভা হল, বিকাল ৫টা

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।